মহাশ্রমণ চরিত কথা-

গৌতম বুদ্ধ তথাগত

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

বুদ্ধদেবের জীবনের ও বৌদ্ধবিহারের কিছু ঘটনা

==========

গৌতম বুদ্ধ (পালি: গোতম) বা শাক্যমুনি বুদ্ধ হলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা। জন্মের পর তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম। আধ্যাত্মিক সাধনা ও জীবন নিয়ে নিজস্ব জ্ঞান-উপলব্ধির পর তিনি বুদ্ধ নামটি গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ৬২৩ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ এবং মহাপরিনির্বাণ সাল ৫৪৩ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ।

প্রধান ক্ষত্রিয় বংশের শুদ্ধোধনের পুত্র ছিলেন তিনি। তার মাতা মায়াদেবী কোলিয় গণের রাজকন্যা ছিলেন। সিদ্ধার্থ গর্ভে থাকাকালীন গৌতম বুদ্ধের মা সাদা হাতি ও পদ্ম ফুলের স্বপ্ন দেখেন। শাক্যদের প্রথা অনুসারে গর্ভাবস্থায় মায়াদেবী শ্বশুরালয় কপিলাবস্তু থেকে পিতৃরাজ্যে যাবার পথে অধুনা নেপালের তরাই অঞ্চলেরে অন্তর্গত লুম্বিনী গ্রামে এক শালগাছের তলায় সিদ্ধার্থের জন্ম দেন। তার জন্মের সময় বা সপ্তম দিনে মায়াদেবীর জীবনাবসান হয়। শুদ্ধোধনের কুল-পুরোহিত জানান বুদ্ধ-এর মধ্যে ৩২ টি মহাপুরুষের লক্ষণ আছে এবং ৪০ টি অন্যান্য লক্ষণ আছে। শুদ্ধোধন শিশুর জন্মের পঞ্চম দিনে নামকরণের জন্য আটজন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানালে তারা শিশুর নাম রাখেন সিদ্ধার্থ অর্থাৎ যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই সময় পর্বতদেশ থেকে আগত অসিত নাম একজন সাধু নবজাত শিশুকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে এই শিশু পরবর্তীকালে একজন রাজচক্রবর্তী অথবা একজন সিদ্ধ সাধক হবেন। একমাত্র সর্বকনিষ্ঠ আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিন্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, এই শিশু পরবর্তীকালে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। মাতার মৃত্যুর পর তিনি বিমাতা মহাপজাপতি গোতমী কর্তৃক লালিত হন। ষোলো বছর বয়সে তাকে সংসারের প্রতি মনোযোগী করার জন্য তার পিতামাতা তাকে কোলিয় গণের সুন্দরী কন্যা যশোধরার সাথে বিবাহ দেন ও রাহুল নামক এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন।

রাহুল (জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব: ৫১১) ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের একমাত্র পুত্র পালি এবং সংস্কৃত ভাষা অনুসারে রাহুল শব্দটি রাহুলা শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ বন্ধন। তার মায়ের নাম যশোধরা বা গোপা দেবী। তার বয়স যখন মাত্র ৭ দিন তখন তার পিতা সিদ্ধার্থ গৌতম সংসার ত্যাগ করেন। বিশ বছর বয়সে তার পিতা গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধিত্ব অর্জন করে রাজধানী কপিলাবস্তু-তে ফিরে আসলে তিনি পিতার কাছ থেকে দীক্ষিত হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু তে পরিণত হন। এর পর তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুক হয়ে রাজত্ব করেন এবং রোজ ভিক্ষুক এর মত থাকতেন, খাবার খেতেন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। বৌদ্ধরা তাকে ভ্রাতা রাহুল বলে সম্বোধন করে।

সিদ্ধার্থ তার জীবনের প্রথম উনত্রিশ বছর রাজপুত্র হিসেবে অতিবাহিত করেন। বৌদ্ধ পুঁথিগুলি অনুসারে পিতা শুদ্ধোধন তার জীবনে বিলাসিতার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ বস্তুগত ঐশ্বর্য্য যে জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না, তা উপলব্ধি করা শুরু করেন। কথিত আছে, উনত্রিশ বছর বয়সে রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রাসাদ থেকে কয়েকবার ভ্রমণে বেরোলে তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ, একজন অসুস্থ মানুষ, একজন মৃত মানুষ ও একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পান। সাংসারিক দুঃখ কষ্টে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সিদ্ধার্থ তার সারথি ছন্নকে এঁদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, ছন্ন তাকে বুঝিয়ে বলেন যে সকল মানুষের নিয়তি যে তারা একসময় বৃদ্ধ, অসুস্থ হয়ে

মৃত্যুমুখে পতিত হবে। মুণ্ডিতমস্তক পীতবর্ণের জীর্ণ বাস পরিহিত সন্ন্যাসী সম্বন্ধে ছন্ন তাকে বলেন, যে তিনি মানুষের দুঃখের জন্য নিজ গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেছেন, তিনিই সন্ন্যাসী। এই নূতন অভিজ্ঞতায় বিষাদগ্রস্ত সিদ্ধার্থ বাধর্ক্য, জরা ও মৃত্যুকে জয় করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে একজন সন্ন্যাসীর জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সংসারের প্রতি বীতরাগ সিদ্ধার্থ এক রাত্রে ঘুমন্ত গৌতম বুদ্ধের ঘোড়ার নাম কন্থক। এই কন্থক তাঁর খুব প্রিয় ছিল । স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে নিঃশব্দ বিদায় জানিয়ে প্রিয় অশ্ব কন্থক ও সারথি ছন্নকে নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রাজবস্ত্র ত্যাগ করে তলোয়ার দিয়ে তার লম্বা চুল কেটে মুণ্ডিতমস্তক হন। এরপর কন্থক ও ছন্নকে বিদায় জানিয়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

সিদ্ধার্থ সারথি ছন্ন সম্পর্কে

****

ছন্ন (পালি: छन्न) বা ছন্দক (সংস্কৃত: छन्दक) সিদ্ধার্থ গৌতমের সারথি ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করে অর্হত হন।

ছন্ন শাক্য প্রজাতন্ত্রের প্রধান শুদ্ধোধনের একজন পরিচারিকার পুত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে দুঃখ ও কষ্ট থেকে দূরে প্রাসাদের বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের পর উনত্রিশ বছর বয়সে শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম তার সারথি ছন্নকে নিয়ে প্রাসাদ থেকে প্রথমবার ভ্রমণে বেরোন। পথে তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ, একজন অসুস্থ মানুষ, একজন মৃত মানুষ ও একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পান। সাংসারিক দুঃখ কষ্টে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সিদ্ধার্থ তার সারথি ছন্নকে এঁদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, ছন্ন তাকে বুঝিয়ে বলেন যে সকল মানুষের নিয়তি যে তারা একসময় বৃদ্ধ, অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। মুণ্ডিতমস্তক পীতবর্ণের জীর্ণ বাস পরিহিত সন্ন্যাসী সম্বন্ধে ছন্ন তাকে বলেন, যে তিনি মানুষের দুঃখের জন্য নিজ গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেছেন, তিনিই সন্ন্যাসী। এই নূতন অভিজ্ঞতায় বিষাদগ্রস্ত সিদ্ধার্থ বাধর্ক্য, জরা ও মৃত্যুকে জয় করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে একজন সন্ন্যাসীর জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সংসারের প্রতি বীতরাগ সিদ্ধার্থ এক রাত্রে ঘুমন্ত স্ত্রী, নবজাত পুত্র, পরিবারকে নিঃশব্দ বিদায় জানিয়ে প্রিয় অশ্ব কন্থক ও সারথি ছন্নকে নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রাজবস্ত্র ত্যাগ করে তলোয়ার দিয়ে তার লম্বা চুল কেটে মুণ্ডিতমস্তক হন। এরপর ছন্নের অনুরোধকে উপেক্ষা করে তাকে বিদায় জানিয়ে সিদ্ধার্থ রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ছন্ন সিদ্ধার্থের অলঙ্কার ও রাজনস্ত্র নিয়ে কপিলাবস্তু ফিরে এলে উদ্বিগ্ন শুদ্ধোধন সিদ্ধার্থের খোঁজে সৈন্য পাঠাতে চাইলে ছন্ন সিদ্ধার্থের স্থির প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে তাকে বারণ করেন।

ছন্নের ভিক্ষু জীবন পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করে শুদ্ধোধনের আমন্ত্রণে কপিলাবস্তু শহরে এলে ছন্ন তাকে অনুসরণ করে সংসার ত্যাগ করে সংঘজীবনে যোগ দেন। কিন্তু পূর্বজীবনে গৌতম বুদ্ধের প্রিয়পাত্র হওয়ায় তিনি ভিক্ষুজীবনে তার অহঙ্কার ত্যাগ করতে অসমর্থ হন। কোশাম্বী রাজ্যের ঘোষিতাশ্রমে তিনি একটি অপরাধ করে অস্বীকার করায় গৌতম বুদ্ধ উৎখেপনিয়-কম্ম আরোপ করে তার সংঘজীবনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরে ছন্ন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে সংঘ জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়। ধম্মপদত্থকথা অনুসারে, গৌতম বুদ্ধের বারংবার সাবধানবাণী সত্ত্বেও সারিপুত্ত ও মোগ্গলনের সঙ্গে ছন্ন দুর্ব্যবহার করার

কারণে গৌতম বুদ্ধ ছন্নের জন্য ব্রহ্মদণ্ড নামক নৈতিক শাস্তি করার জন্য আনন্দকে নির্দেশ দেন। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করা হলে, সেখানে ছন্নের ওপর ব্রহ্মদণ্ড আরোপ করে তাকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই সংবাদে ছন্ন অনুতপ্ত হয়ে অর্হত হিসেবে গণ্য হন।

প্রথমে সিদ্ধার্থ আলার কালাম নামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট যোগ শিক্ষা করেন যিনি ছিলেন সাংখ্য দর্শনের অনুসারী। কিন্তু তার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর লাভ না করায় এরপর তিনি উদ্দক রামপুত্ত নামক অপর একজন সন্ন্যাসীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যোগশিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু এখানেও তার জিজ্ঞাসা পূরণ না হওয়ায় তিনি তাকে ত্যাগ করে বুদ্ধগয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক একটি রম্য স্থানে গমন করেন।

শরীরকে অপরিসীম কষ্ট প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিলাভ হয় এই বিশ্বাসে তিনি ও অন্য পাঁচজন তপস্বী ছয় বছর ধরে অনশন, শারীরিক নিপীড়ন ও কঠোর সাধনায় অতিবাহিত করেন। দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যার পর তার শরীর অস্থিচর্মসার হয়ে পড়ে ও তার অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা কমে গিয়ে তিনি মরণাপন্ন হলে তার উপলব্ধি হয় যে, অনশনক্লিষ্ট দুর্বল দেহে শরীরকে অপরিসীম কষ্ট দিয়ে কঠোর তপস্যা করে বোধিলাভ সম্ভব নয়। ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্রানুসারে, অসংযত বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং কঠোর তপস্যার মধ্যবর্তী একটি মধ্যম পথের সন্ধান করে বোধিলাভ সম্ভব বলে তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি তাই আবার খাদ্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন ও সুজাতা নাম্নী এক স্থানীয় গ্রাম্য কন্যার কাছ থেকে তিনি এক পাত্র পরমান্ন আহার করেন। (সুজাতার কথা বিস্তারিত আগেই বর্ণিত হয়েছে) সিদ্ধার্থকে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখে তার পাঁচজন সঙ্গী তার ওপর বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে চলে যান। বুদ্ধ যেখানে ধ্যানে বসে ছিলেন সেটি নৈরঞ্জনা নদীর তীরে। নৈরঞ্জনা নদীর বর্তমান নাম ফল্গু (Falgu)।

এই ঘটনার পরে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় তিনি ধ্যানে বসেন এবং সত্যলাভ না করে স্থানত্যাগ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। উনপঞ্চাশ দিন ধরে ধ্যান করার পর তিনি বোধি প্রাপ্ত হন। দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব অর্জন করার পর তাঁর নাম হয় বুদ্ধ বা তথাগত বা পরম জ্ঞানী। বুদ্ধ শব্দের অর্থ হল যিনি পরম শাশ্বত বোধ বা জ্ঞান লাভ করেছেন। বুদ্ধত্ব অর্জন করার পর গৌতম বুদ্ধ আরো সাত সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের তলায় উপবেশন করে তাঁর নবলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তাশীল ছিলে। এই সময় তিনি মানব জীবনে দুঃখ ও তার কারণ এবং দুঃখ নিবারণের উপায় সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন, যা চতুরার্য সত্য বা Four Noble Truths নামে খ্যাত হয়। তার মতে এই সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ সম্ভব।

বোধিলাভের পর গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে তপুস্স ও ভল্লিক নামক বলখ অঞ্চলের দুইজন ব্যবসায়ীর সাক্ষাত হয়, যারা তাকে মধু ও বার্লি নিবেদন করেন। এই দুইজন বুদ্ধের প্রথম সাধারণ শিষ্য। বুদ্ধ তার প্রাক্তন শিক্ষক আলার কালাম ও উদ্দক রামপুত্তের সাথে সাক্ষাত করে তার নবলব্ধ জ্ঞানের কথা আলোচনার জন্য উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তাদের দুইজনেরই ততদিনে জীবনাবসান হয়ে গেছিল। এরপর তিনি বারাণসীর নিকট ঋষিপতনের মৃগদাব উদ্যানে যাত্রা করে তার সাধনার সময়ের পাঁচ প্রাক্তন সঙ্গী, যারা তাকে একসময় পরিত্যাগ করেছিলেন, তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ও তাদেরকে তার প্রথম শিক্ষা প্রদান করেন, যা বৌদ্ধ ঐতিহ্যে ধর্মচক্রপ্রবর্তন নামে খ্যাত। এইভাবে তাদের নিয়ে ইতিহাসের প্রথম বৌদ্ধ সংঘ গঠিত হয়। যশ নামে

এক ধনী বণিক ও তার পিতা হল গৌতম বুদ্ধের প্রথম গৃহী শিষ্য। যশের স্ত্রী ও মা দুজনেই বুদ্ধের প্রথম উপাসিকা।

এরপর মহাকশ্যপ নামক এক অগ্নি-উপাসক ব্রাহ্মণ ও তার অনুগামীরা সংঘে যোগদান করেন। বুদ্ধ সম্রাট বিম্বিসারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিমতো বুদ্ধত্ব লাভের পরে রাজগৃহ যাত্রা করলে সঞ্জয় বেলাট্ঠিপুত্তের দুইজন শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্গাল্যায়ন সংঘে যোগদান করেন।

বুদ্ধত্ব লাভের এক বছর পরে শুদ্ধোধন তার পুত্রকে কপিলাবস্তু শহরে আমন্ত্রণ জানান। একদা রাজপুত্র গৌতম রাজধানীতে সংঘের সাথে ভিক্ষা করে খাদ্য সংগ্রহ করেন। কপিলাবস্তুতে তার পুত্র রাহুল তার নিকট শ্রমণের দীক্ষাগ্রহণ করেন। এছাড়া আনন্দ ও অনুরুদ্ধ নামক তার দুইজন আত্মীয় তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। (আনন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত আগেই বলা হয়েছে) মহাকশ্যপ, সারিপুত্ত, মৌদ্গাল্যায়ন, আনন্দ, অনুরুদ্ধ ও রাহুল ছাড়াও উপালি, মহাকাত্যায়ন,পুণ্ণও সুভূতি বুদ্ধের দশজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

তিন বছর পরে রোহিণী নদীর জলের অংশ নিয়ে শাক্যদের সাথে কোলীয় গণের একটি বিবাদ উপস্থিত হলে বুদ্ধ সেই বিবাদের মীমাংসা করেন। এর কয়েকদিনের মধ্যে শুদ্ধোধন মৃত্যুবরণ করলে গৌতম বুদ্ধের বিমাতা মহাপজাপতি গোতমী সংঘে যোগদানে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গৌতম প্রথমে নারীদের সংঘে যোগদানের ব্যাপারে অমত প্রকাশ করলেও আনন্দের উৎসাহে তিনি সংঘ গঠনের পাঁচ বছর পরে সংঘে নারীদের ভিক্ষুণী হিসেবে প্রবেশের অনুমতি দেন।

উত্তর ভারতের বারাণসীর বর্তমান হরিণ-পার্ক বা মৃগদাব নামক জায়গাটিতে বৌদ্ধ তাঁর পাঁচ-সঙ্গীকে প্রথম ধর্মদেশনা প্রদান করেছিল। বুদ্ধ সহ তাঁর এই পাঁচ সন্ন্যাস সহচর মিলে প্রথম সংঘ (ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের দ্বারা গঠিত সম্প্রদায়) গঠন করেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ-গ্রন্থ অনুযায়ী, প্রাথমিক অনিচ্ছা থাকার সত্ত্বেও গৌতম বুদ্ধ পরে সন্ন্যাসীনিদেরও সংঘের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীনিদের “ভিক্ষুণী” হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধের মাসি এবং তাঁর সৎ-মা মহাপজাপতি গোতমী ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম ভিক্ষুণী। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে তিনি ভিক্ষুণী হিসেবে সন্ন্যাস পদ গ্রহণ করেন।

জানা যায়, বুদ্ধ তাঁর অবশিষ্ট জীবনের বছরগুলোতে ভারতের উত্তরাঞ্চল ও অন্যান্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলগুলোতে পরিভ্রমণ করেন।

গৌতম বুদ্ধ যে স্থানগুলিতে ধর্ম প্রচার করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–রাজগৃহ, দক্ষিণাগিরি, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, বৈশালী, বারানসী, চম্পা,পাবা, কুশিনগর ইত্যাদি। তিনি সর্বাধিক সময় বাস করেন কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে-দীর্ঘ ২১ বছর। মগধ রাজ বিম্বিসার গৌতম বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নেন। যে সমস্ত বিখ্যাত রাজারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাদের নামগুলো হল বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ, উদয়ন, প্রদ্যোত, অশোক, দশরথ, ইন্দো গ্রিক শাসক মিলিন্দ বা মিনান্দার, কুষাণ রাজা কনিষ্ক, বর্ধন রাজ হর্ষবর্ধন, পাল রাজা গোপাল, ধর্মপাল ও রামপাল।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর পিতা শুদ্ধোধন, পালিতা মা মহাপ্রজাপতি গৌতমী, স্ত্রী যশোধরা, পুত্র রাহুল ও ঘনিষ্ঠ দেবদত্ত কে দীক্ষা দিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের শিষ্যা বিশাখা সন্ন্যাসিনী দের জন্য পুব্বারাম নামে একটি বৌদ্ধমঠ তৈরি করে দিয়েছিলন। বৈশালীর বিখ্যাত বারাঙ্গনা আম্রপালি বৌদ্ধসংঘে তাঁর বিখ্যাত আম্রকুঞ্জ দান করেছিলেন।

মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত অনুসারে গৌতম বুদ্ধের বয়স যখন আশি বছর, তখন তিনি তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন। পওয়া নামক একটি স্থানে অবস্থান করার সময় চণ্ড নামক এক কামার তাকে ভাত ও শূকরমদ্দভ ইত্যাদি খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই খাবার খাওয়ার পরে গৌতম আমাশয় দ্বারা আক্রান্ত হন। চণ্ডের দেওয়া খাবার যে তার মৃত্যু কারণ নয়, আনন্দ যাতে তা চণ্ডকে বোঝান, সেই ব্যাপারে বুদ্ধ নির্দেশ দেন।

এরপর আনন্দের আপত্তি সত্ত্বেও অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তিনি কুশীনগর যাত্রা করেন। এইখানে তিনি আনন্দকে নির্দেশ দেন যাতে দুইটি শাল বৃক্ষের মধ্যের একটি জমিতে একটি কাপড় বিছিয়ে তাকে যেন শুইয়ে দেওয়া হয়। এরপর শায়িত অবস্থায় বুদ্ধ উপস্থিত সকল ভিক্ষু ও সাধারণ মানুষকে তার শেষ উপদেশ প্রদান করেন। তার অন্তিম বাণী ছিল “বয়ধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথা”, অর্থাৎ “সকল জাগতিক বস্তুর বিনাশ আছে। অধ্যবসায়ের সাথে আপনার মুক্তির জন্য সংগ্রাম কর।” বুদ্ধ কুশীনগরের পরিত্যাক্ত এক জঙ্গলে দেহত্যাগ বা মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। মারা যাওয়ার পূর্বে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রচার করা ধর্মীয়দেশনাই হবে তাদের শাস্তা যা তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করবে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর হতে বুদ্ধবাণীকে সংরক্ষণের জন্য শত শত অহরত পণ্ডিত ভিক্ষু তিনটি সঙ্গায়নের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম পূর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত থাকলেও পরে এই প্রাচীন ভূ-খন্ড থেকে বৌদ্ধ ধর্ম অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় শাস্ত্রের উৎসগুলো দুইটি ধর্মীয় মহাসঙ্গীতি সংরক্ষণ করেন, যার একটি হলো বুদ্ধের পাঠগত শিক্ষা সংরক্ষণের জন্য সন্ন্যাসী সংঘ ও আরেকটি হলো সংঘের অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতামুলক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়সমূহ।

বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী বুদ্ধের জন্মের প্রতীক হল Lotus and বুলেট বা পদ্ম ও ষন্ড। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী গৃহ পরিত্যাগ বা মহাভিনিষ্ক্রমণ এর প্রতীক হল Horse বা অশ্ব। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী নির্বাণ লাভের প্রতীক হল Bodhi Tree বা বোধি বৃক্ষ। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী প্রথম ধর্ম প্রচার বা ধর্মচক্রপ্রবর্তন এর প্রতীক হল Wheel বা ধর্মচক্র। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী মহাপরিনির্বাণ এর প্রতীক হল Stupa বা স্তুপ। বৌদ্ধ ধর্মে স্তুপ এর অর্থ হল যেখানে বুদ্ধ বা বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অবশেষ সংরক্ষিত করা হয়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ কে বৌদ্ধধর্মে “চারিকা” বলে। বৌদ্ধ ধর্মে চৈত্য মানে যেখানে প্রার্থনা করা হয়। আর্যসত্য বৌদ্ধধর্ম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৌদ্ধধর্ম চারটি মহান সত্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, এগুলিকে আর্যসত্য বলে। আর্যসত্য চারটি। এগুলি হল- দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামী মার্গ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ এর প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী দুঃখের বিনাশের জন্য গৌতম বুদ্ধ আটটি পথের কথা বলেছেন যাকে অষ্ট মার্গ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ গুলি হল–সৎ বাক্য, সৎ কার্য, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ চিন্তা, সৎ সংকল্প, সৎ দৃষ্টি ও সৎ সমাধি। গৌতম বুদ্ধ যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তার নাম

“মঝঝিম পন্থা” বা মধ্যপন্থা বা মধ্যপথ। তিনি চরম ভোগ বিলাস ও চরম কৃচ্ছসাধনের মধ্যবর্তী পথের কথা বলেছেন। বৌদ্ধধর্ম মতে দুঃখের আসল কারণ Desire বা চাহিদা। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে মানুষের আসল লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভ করা। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে মানুষের আসল লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভ করা। বৌদ্ধধর্মে প্রজ্ঞা মানে পরম জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মে গৌতম বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ এই তিনটি ত্রিরত্ন নামে পরিচিত।

পঞ্চশীল নীতি বৌদ্ধধর্মের অংশ। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধ পাঁচটি মূলনীতিকে মেনে চলতে বলেছেন যা পঞ্চশীল নামে পরিচিত।

এগুলি হল চুরি না করা, মিথ্যা কথা না, ব্যভিচারী না হওয়া, অহিংস নীতি গ্রহণ করা ও অন্যায় না করা।

বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানের সাত উৎস–স্মৃতি, কৌতুহল, কর্মশক্তি, আনন্দ, প্রশান্তি, ধ্যান ও সুষমাবোধ। বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী পূন্যার্জনের চারটি সহজ উপায় হল-ঔদার্য, দানশীলতা, সহযোগিতা ও সেবা। গৌতম বুদ্ধ শান্তি পাবার জন্য চারটি ভাব অর্জন করার কথা বলেছেন-মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

১ম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি (খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দি) প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি গঠিত হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর অর্থাৎ বুদ্ধের দেহত্যাগের পর। খৃষ্ট-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে মহাকাশ্যপ নামক বুদ্ধের একজন কাছের শিষ্যের তত্ত্বাবধানে এবং রাজা অজাতশত্রুর সমর্থনে এই প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি গঠিত হয়। এই মহাসঙ্গীতি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাণীগুলোকে মতবাদ-সংক্রান্ত শিক্ষায় (তথা সূত্রে) এবং অভিধর্মে রূপান্ততরিত করা এবং বৌদ্ধের সন্ন্যাসগত নিয়ামাবলীকে লিপিবদ্ধ করা। এই মহাসঙ্গীতি বৌদ্ধের খুড়তুতো ভাই এবং তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডাকা হয় বুদ্ধের উপদেশ এবং অভিধর্ম আবৃত্তি করার জন্য এবং বুদ্ধের আরেক প্রধান শিষ্য উপালি কে বলা হয় বিনয়ের সূত্রসমূহ পাঠ করার জন্য। এগুলোই মূলত ত্রিপিটকের মূল ভিত্তি হিসেবে পরিচয় লাভ পায় যেগুলো পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়।

ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মীয় পালি গ্রন্থের নাম। পালি তি-পিটক হতে বাংলায় ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন। তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রিপিটক বোঝানো হচ্ছে। এই তিনটি পিটক হলো বিনয় পিটক, সুত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। পিটক শব্দটি পালি এর অর্থ-ঝুড়ি, পাত্র, বক্স ইত্যাদি। অরিজিনাল লেখাগুলি লেখা হয়েছিল তাল পাতার উপর এবং রাখা হয়েছিল একটি ঝুড়িতে তাই গ্রন্থগুলোকে বলা হয় ত্রিপিটক। ত্রিপিটক গুলি রচিত হয় পালি ভাষায়। প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলনে সুত্তপিটক ও বিনয় পিটক পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। সুত্ত পিটক সংকলন করেন আনন্দ। বিনয় পিটক সংকলন করেন উপালি। সুত্ত পিটক এর বিষয়বস্তু হল বুদ্ধের উপদেশাবলী। বিনয় পিটক এর বিষয়বস্তু হল বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দের পালনীয় বিধি এবং সংঘের নিয়মাবলী।

ইতিহাসে এরকম এই পর্যন্ত ছয়টি সঙ্গায়ন হয়েছে। প্রথম সঙ্গায়ন হয়েছিল বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর রাজা অজাতশত্রু'র পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের সপ্তপর্ণী গুহায়। দ্বিতীয়টি হয়েছিল বৈশালীতে কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায়। তৃতীয়টি হয়েছিল সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় যেখানে অভিধর্ম পিটক প্রথম আলোচিত হয় । অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধদের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এভাবে বড় বড় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপিটক বুদ্ধবচন সংরক্ষিত হয়ে আসছে। তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে ভিক্ষুদের মধ্যে একতা বজায় রাখার কথা

বলা হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মপ্রচারের কথা বলা হয়। সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য নিজের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে শ্রীলংকা পাঠান।

চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন হয় ৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের কুন্দলা বনে। চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বসুমিত্র ও সহ-সভাপতি ছিলেন অশ্বঘোষ। চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুষানরাজ কনিষ্ক। চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলনে সংকলিত হয় মহাভিভাষা শাস্ত্র যা ত্রিপিটকের সংস্কৃত রূপ যা রচনা করেন সভাপতি বসুমিত্র। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সভাকবি অশ্ব ঘোষ এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হল-বুদ্ধ চরিত, সারিপুত্র প্রকরণ, সৌন্দরানন্দ, বজ্রসূচী, ও সূত্রালঙ্কার। সব বই গুলিই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন এর সভাপতি বসুমিত্রের লেখা বিখ্যাত বইয়ের নাম হল মহাবিভাষা শাস্ত্র যা সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এই সম্মেলনে বৌদ্ধরা হীনযান ও মহাযান নামে দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। হীনযানরা পালিভাষাকে পছন্দ করে। হীনযানরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করে না। হীনযানেরা গৌতম বুদ্ধের আসল টিচিং অনুসরণকারী। হীনযানেরা Southern Buddhist Religion নামে পরিচিত কারণ ইন্ডিয়ার দক্ষিণে Sri Lanka, Burma (Myanmar), Shyam(Thailand), Java ইত্যাদি স্থানের লোকেরা হীনযান মত অনুসরণকারী। হীনযানদের দুটি শাখা ছিল– বৈভাষিক (Vaibhasika) ও সৌতান্তিক বা সৌতান্ত্রিক (Soutantrika)।

মহাযানরা বুদ্ধকে ভগবান বলে বিশ্বাস করত। মহাযানরা সংস্কৃত ভাষাকে পছন্দ করে। মহাযানেরা Northern Buddhist Religion নামে পরিচিত। কারন চীন, কোরিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশে এদের প্রভাব বেশি। মহাযানদের ও দুটি শাখা ছিল–মাধ্যমিক ও যোগাচার। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন নাগার্জুন। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন মৈত্রেয়নাথ (Maitreyanath) এবং তার শিষ্য অসঙ্গ (Asanga)। মহাযান সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ সূত্র গুলি হল "সদ্ধর্ম পুণ্ডরিকা সূত্র।" পন্ডিতদের মতে মহাযান শব্দটি ছিল না তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হত প্রাকৃত শব্দ "মহাজান" বা "মহাজ্ঞান।" চীন দেশে মহাযান ধর্মমত সর্বপ্রথম প্রচার করেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লোকক্ষেমা খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে।

এছাড়া বজ্রযান বলে বৌদ্ধধর্মের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ভাগ আছে যারা গোপন মন্ত্র তন্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখে। এরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম পালন করে। বজ্রযানের প্রভাব Eastern India (West Bengal, বিহার, তিব্বত বা Tibet etc), Bangladesh প্রভৃতি স্থানে এদের প্রভাব বেশি।

Milindapanho-এর অর্থ হল মিলিন্দ এর প্রশ্ন-Question of Milinda. Milinda ও Menander একই। Milinda অনেক প্রশ্ন করেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনকে। নাগসেন উত্তর দিয়েছিলেন। এই সমস্ত তথ্য নিয়েই Milindapanho।

বুদ্ধঘোষের দুটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম হল বিশুদ্ধমগ্গ ও সুমঙ্গলভাষিণী। নাগার্জুন এর লেখা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই হল–মাধ্যমিক কারিকা ও প্রজ্ঞাপারমিতা কারিকা ।

বৌদ্ধধর্মে আটটি স্থানকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। এদেরকে অষ্টস্থানস বা Asthasthanas বলে। এগুলি হল–লুম্বিনী, সারনাথ, বোধ গয়া, কুশিনগর, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী এবং সাংকাস্য (Sankasya)। Asthasthanas ছাড়া প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখযোগ্য স্থান গুলি হল বিহারের নালন্দা, গুজরাটের

জুনাগড় ও বলভি, মধ্যপ্রদেশের সাঁচি, মহারাষ্ট্রের অজন্তা ইলোরা, উড়িষ্যার ধৌলগিরি, উত্তর প্রদেশের কনৌজ, কুশাম্বি, মথুরা, বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) জগদ্দল এবং সোমাপুরী, অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনিকোন্দা ও অমরাবতী। ছটি বিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল–নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশিলা, সোমাপুরী, জগদ্দল বা জগদল ও বলভি বা বল্লভি। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যে, বর্তমানে বিহারের পাটনা শহর থেকে ৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বা নালন্দা বৌদ্ধ বিহার। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ৩০ একর বা ১২ হেক্টর জায়গার উপর। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বা নালন্দা বৌদ্ধ বিহার এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্ত বা শক্রাদিত্য। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম হল আর্যভট্ট, নাগার্জুন, আর্যদেব, অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র, হিউয়েন সাং, ইৎসিং ইত্যাদি। হিউয়েন সাং দু'বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এ ছিলেন। হিউয়েন সাং এখানে অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যাপনার কাজও করেন। ইৎসিং নামক এক চীনা পর্যটক প্রায় ১০ বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এ ৮ টি সভা গৃহ ও ৩০০ টি কক্ষ ছিল। হিউয়েন সাং এর শিক্ষক হলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্র। খুব সম্ভবত ১২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বকতিয়ার খিলজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কে ধ্বংস করেন।

ওদন্তপুরী বর্তমান বিহারে অবস্থিত একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় যা নালন্দা থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত ছিল। ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন পাল বংশের রাজা গোপাল। ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হলেন শীল রক্ষিত। নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের পর অতীশ দীপঙ্কর শীল রক্ষিতের কাছেও শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বিক্রমশীলা মহাবিহার পাল যুগে ধর্মপালের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বিহারের ভাগলপুরের ৫০ কিমি পূর্বে অবস্থিত। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত অধ্যক্ষ হলেন অতীশ দীপঙ্কর। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ দিকে ৬ টি প্রবেশদ্বার ছিল এবং প্রত্যেকটিতে একজন করে বিখ্যাত পন্ডিত দ্বারপাল হিসেবে থাকতেন। জেতরি বলে এমন একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন তিনি প্রথমে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বারপাল ছিলেন পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন।

সোমপুর বা সোমাপুরী বা পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান বাংলাদেশের পাহাড়পুর নওগাঁ ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল এই মহাবিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। জগদল বিহার নওগাঁ জেলার সদর থেকে ৬৫ কিমি উত্তরে জগদল গ্রামে অবস্থিত। জগদল বিহার এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন রামপাল। জগদল বিহার এর দুজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম হল দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র। ১২০০ সাল নাগাদ বিখ্যাত কাশ্মীরি পন্ডিত শাক্যশ্রীভদ্র জগদ্দল বা জগদল বিহারে যান।

বলভি বা বল্লভি মহাবিহারটি বর্তমানের সৌরাষ্ট্র গুজরাটে অবস্থিত। বলভি মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ভট্টার্ক।

অনুরাধাপুরা মহাবিহার শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত।

বুদ্ধ মহাজনপদের যুগে মগধ সাম্রাজ্যের শাসক বিম্বিসারের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন, শিক্ষাদান করেছিলেন এবং একটি ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (আনু. ৫৫৮ – আনু. ৪৯১ BCE), তার মৃত্যু হয়েছিল বিম্বিসারের উত্তরসূরি অজাতশত্রু শাসনকালের প্রথম দিকে। সেই হিসেবে বুদ্ধ ছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের কনিষ্ঠ

সমসাময়িক। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ ছাড়াও বুদ্ধের জীবন ছিল আজীবক, চার্বাক, জৈনধর্ম ও অঞ্জন প্রভৃতি প্রভাবশালী শ্রমণ চিন্তাধারার উদয়কালের সমসাময়িক। দীর্ঘ নিকায় গ্রন্থে ব্রহ্মজল সুত্রে এই ধরনের বাষট্টিটি মতবাদের কথা বিবৃত হয়েছে। সেই যুগেই মহাবীর, পূরণ কস্সপ, মকখলি গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত প্রমুখ প্রভাবশালী দার্শনিক তাদের মত প্রচার করেছিলেন। পিটকে সামান্নফল সুত্র এঁদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বুদ্ধ নিশ্চয় এঁদের মতবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বুদ্ধের প্রধান দুই শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্গাল্যায়ন প্রথম জীবনে ছিলেন সংশয়বাদী সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্তর প্রধান শিষ্য। ত্রিপিটকে প্রায়শই দেখা যায় যে, বুদ্ধ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মতধারার সমর্থকদের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন। অর্থাৎ, বুদ্ধ নিজেও ছিলেন সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রমণ দার্শনিক। এমনও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে আলার কালাম ও উদ্দক রামপুত্ত নামে দুই দার্শনিকও ঐতিহাসিক চরিত্র। বুদ্ধের জীবনকথায় “জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি, সন্ন্যাসগ্রহণ, আধাত্মিক অনুসন্ধান, বোধিলাভ, শিক্ষাদান ও মৃত্যু”র ধারাটি সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও, প্রথাগত জীবনীগ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে মতৈক্য খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

মানুষ যাকে ধারণ করে থাকে সেটাই ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও নীতির পুরোটাই প্রাচীন হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্মের অংশ বিশেষ, যা বুদ্ধদেব হিন্দু ধর্ম থেকেই নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের উদগাতা গৌতম বুদ্ধ নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। হিন্দু ধর্মের অহিংসা, প্রেম, সেবা, ত্যাগ, তিতিক্ষার কথাই বুদ্ধদেব বলেছেন তাঁর মত করে আবার এই বৌদ্ধ ধর্ম ও শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মনীতি নিয়ে যীশু খ্রীষ্ট প্রতিষ্ঠা করেন খ্রীষ্ট ধর্ম যার নীতি পুরোটাই বৌদ্ধ ধর্মের থেকে নেওয়া, তার মানে দাঁড়ালো প্রকারান্তরে হিন্দু ধর্মেরই নীতি নিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ লাভ আমাদের সনাতন ধর্মে মোক্ষপ্রাপ্তি এবং নির্বাণ লাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলছেন বুদ্ধদেব যা পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সমস্ত সাধু মহাত্মারা বলে গেছেন ঈশ্বর দর্শনই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বলে। ঈশ্বর দর্শনের অনেক পথ, কিন্তু ইউনিভার্সাল পন্থা হলো শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ করে চেতনাকে ষটচক্র ভেদ করে আজ্ঞাচক্রে বা তার ওপরে স্থাপন করা যা কারো পক্ষেই কোনো এক জন্মে সম্ভব নয়, সেই স্তরে চেতনা যেতে কয়েক হাজার জন্ম লাগে যার পুরোটাই গুরুপ্রদত্ত কর্ম ও গুরুকৃপায় সম্ভব, এটা আমার কথা নয়, সিদ্ধ মহাত্মা ও সদগুরুদের প্রবচনে আছে। নির্বাণ লাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি মানে জীবন মৃত্যুর চক্রের বাইরে যেতে পারা সেও গুরুকৃপায়, বুদ্ধদেবকেও সাংখ্য দর্শনের সাধনা ও ষটচক্রের সাধনা করতে হয়েছে এবং মধ্যম পন্থা দিয়েই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন যা সেই সনাতন হিন্দু ধর্মেরই পথ। সব ধর্মেরই নীতি শিক্ষা মানবপ্রেম, অহিংসা, সেবা, ত্যাগ কিন্তু তার উপস্থাপনার জন্য পাল্টে যায় তাকে অনুসরণ করে চলা মানুষের জীবনবোধ। তার অন্যতর ব্যাখ্যা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে যা ধ্বংসের রাস্তাই সুগম করে। তাই সনাতন হিন্দু ধর্ম আজও বলে, “আত্মনং বৃদ্ধি”.... আত্মাকে জানা অর্থাৎ আত্মদর্শন, যা হলে পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মও মানুষ অবগত হয়। এই সাধনার অধিকারী একমাত্র মানুষ, তাই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। চুরাশি হাজার অচেতন ও সচেতন যোনি পেরোলে লাভ হয় মনুষ্যজন্ম, সেখান থেকে শুরু হয় তার উত্তরণের ও চেতনাকে উর্দ্ধগামী করার সাধনা, ক্ষেত্র তৈরী হলে তবেই সদ্গুরু এসে হাতটা ধরেন তাকে উন্নীত করতে উচ্চস্তরে। বুদ্ধদেব বলছেন চাহিদা জীবের দুর্দশার কারণ সেই চাহিদা বা আকাঙ্খার শেষই করতে বলছেন সারদা মা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, আদি শংকর। বহিরঙ্গের চাহিদা নয়, আপন অন্তরে ডুব দিলেই হবে আত্মদর্শনের রাস্তা সুগম।

গরিবকে দেওয়া উপদেশ

গৌতম বুদ্ধ একবার তার শিষ্যদের সাথে একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামের লোকেরা তাদের সমস্যা নিয়ে গৌতম বুদ্ধের কাছে যেত এবং তাদের সমস্যার সমাধান নিয়ে হাসি মুখে বাড়ি ফিরে যেত। ওই গ্রামের রাস্তার ধরে একটি লোক বসে থাকতো এবং গৌতম বুদ্ধের কাছে আসা প্রতিটি লোককে খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতো, সে এটা দেখে খুব অবাক হতো যে লোকতো আসে বেশ মনখারাপ নিয়ে, কিন্তু যখন তারা গৌতম বুদ্ধের দর্শন করে ফিরত তারা ভারী খুশি থাকত, এবং মুখে থাকতো একটা হাসি।

তাই গরিব ব্যক্তিটি মনে মনে ভাবলো যদি আমিও আমার সমস্যার কথা গৌতম বুদ্ধের কাছে গিয়ে বলি তো কেমন হয়। তাই সে গৌতম বুদ্ধের সাথে দেখা করতে চলে গেলো। গিয়ে দেখলো লোকজন লাইনে দাঁড়িয়ে আছে এবং সবাই নিজের সমস্যার কথা বলছিলো এবং গৌতম বুদ্ধ হাসিমুখে তাদের সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছিলেন।

দেখতে দেখতে ওই গরিব লোকটির নম্বর এলো। সর্বপ্রথম ওই লোকটি গৌতম বুদ্ধকে প্রণাম করে বললো, বাবা এই গ্রামে সবাই সুখী, একমাত্র আমিই গরিব এব দুঃখিত। তখন গৌতম বুদ্ধ হেসে বললেন তুমি এই গ্রামে একমাত্র গরিব সেটার একমাত্র কারণ হলো, আজ পর্যন্ত তুমি কাউকে কিছু দাও নি।

গৌতম বুদ্ধের এই কথা শুনে লোকটি ভীষণ অবাক হয়ে গেলো এবং সে গৌতম বুদ্ধকে বললো, বাবা আমি গরিব অন্যকে দেয়ার মতো আমার কাছে কি আছে? আমি নিজেই অনেক কষ্ট করে ভিক্ষা করে দুবেলার দুমুটো অন্ন জোগাড় করি।

গৌতম বুদ্ধ খুব মনোযোগ সহকারে লোকটির কথা শুনছিলেন এবং বললেন, সত্যিই তুমি একটা মূর্খ লোক। অন্যকে দেবার জন্য ঈশ্বর তোমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, তোমার মুখের হাসি দিয়েছেন যা দিয়ে তুমি অন্যে লোকের মধ্যে আশা জাগাতে পারো, তোমাকে মুখ দিয়েছেন যা দিয়ে তুমি অন্য লোকের সাথে মিষ্টি কথা বলতে পারো, অন্যের প্রশংসা করতে পারো, ঈশ্বর তোমাকে দুটি হাত দিয়েছেন যা দিয়ে তুমি অন্য লোককে সাহায্য করতে পারো।

আর ঈশ্বর এই তিনটি জিনিস যাকে দিয়েছেন সে কখনো গরিব হতে পারে না। গরিব তো মানুষ নিজের মন থেকে হয়ে থাকে। আর এটা একটি ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছু না। আর এই ভুল ধারণা আমাদের জীবন থেকে দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। .

গৌতম বুদ্ধ লোকটিকে বললেন যদি তুমি তোমার মনে গরিব হওয়া ও টাকা না হওয়ার চিন্তা আসতে দাও, তা হলে সেটা তোমার গরিব হওয়ার কারণ হবে। আর যদি এগুলো চিন্তা জীবন থেকে দূর করে দাও তাহলে তোমার একদিন গরিবী একদিন অবশ্য দূর হয়ে যাবে।

গৌতম বুদ্ধের এই কথাটি শুনে ওই গরিব ব্যক্তিটির মুখে হাসি ফুটে উঠে এবং ওই ব্যক্তিটি গৌতম বুদ্ধের এই উপদেশগুলি তার নিজের জীবনে পালন করে চলতে লাগলো। যার কারণে সে আর কখনো দুঃখী হয় নি।

জীবনে শান্তি পাওয়ার উপায়

==========

মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ একটি নদীর তীরে একান্তে একটি ঝুপড়িতে বসবাস করতেন। গৌতম বুদ্ধ তার ঝুপড়ীর চারিপাশে সবুজ গাছপালা লাগিয়ে রেখেছিলেন এবং তার লাগানো গাছ পালার মধ্যে অনেক পাখিরা বসবাস করতো।

সকাল, বিকেল পাখির মধুর শব্দে গৌতম বুদ্ধকে সবসময় আনন্দিত করে রাখতো। এমন মনে হতো এই গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, নদী সবই যেমন গৌতম বুদ্ধের পরিবার। গৌতম বুদ্ধ নিজের এই পরিবারের সাথে খুব আনন্দে থাকতেন।

একদিন ভোরবেলা গৌতম বুদ্ধ দেখেন তার দরজার পাশে এক জমিদার দাঁড়িয়ে আছেন। জমিদারকে অনেক চিন্তিত মনে হচ্ছিলো। গৌতম বুদ্ধ জমিদার কে তার কাছে আসার কারণ এবং জমিদার কেন এতো চিন্তিত তার কারণ জানতে চাইলেন।

জমিদার তখন গৌতম বুদ্ধকে বললেন “বাবা” আমার টাকা-পয়সা, সম্পত্তির কোনো অভাব নেই, আমার একটি সুখী পরিবার আছে, আমার বা আমার পরিবারের কোনো রোগ নেই। তবুও আমি রাত্রি বেলা ঘুমোতে পারি না। মনে সবসময় একটি অশান্তি বাস করছে, এমন কেন হয়?” জমিদার গৌতম বুদ্ধের কাছে জানতে চাইলেন।

গৌতম বুদ্ধ জমিদারের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। গৌতম বুদ্ধ জমিদার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, দেখো তোমার কাছে সবকিছু আছে ঠিক কিন্তু তোমার কাছে সেই জিনিস নেই, যে জিনিস তোমার নিদ্রার জন্য প্রয়োজন।

তখন জমিদার গৌতম বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সেটা কি জিনিস বাবা?” গৌতম বুদ্ধ বললেন “তুমি চতুর্দিকে চিন্তার মধ্যে ঘিরে আছো। ধন -সম্পত্তির চিন্তা, ব্যবসার চিন্তা, পরিবারের চিন্তা। শান্তি এবং চিন্তার মধ্যে সবসময় শত্রুতা থাকে। তোমার ভেতরে ভীষণ চিন্তার শব্দ তোমাকে নৈঃশব্দে আসতে দিচ্ছে না।” তখন জমিদার এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি, তা গৌতম বুদ্ধের কাছে জানতে চাইলে, গৌতম বুদ্ধ জমিদারকে বললেন, “তুমি প্রকৃতি থেকে থেকে শিক্ষা নাও, প্রকৃতি তার গাছ-পালা, ফল-মূল, জল, বাতাস, আলো, আকাশ অনেক মূল্যবান সম্পদ চতুর্দিকে তার দুহাত দিয়ে ছড়িয়ে রেখেছে।

গৌতম বুদ্ধ জমিদারকে বললেন, “জমিদার তুমি যদি প্রকৃতি থেকে প্রেরণা নিয়ে প্রকৃতির মতো নিজের জীবন গঠন করো, তাহলে দেখবে তোমার জীবনের সব চিন্তা, সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে এবং রাত্রিতে ভালোভাবে নিদ্রাও হবে।”

জমিদার গৌতম বুদ্ধের কথা বুঝতে পারলেন, জমিদার লোককল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন এবং শান্তিতে জীবন যাপন করতে শুরু করতে লাগলেন।

গৌতম বুদ্ধের এই গল্প থেকে একটি শিক্ষা পেলাম যে, জ্ঞান ও ধন যত তুমি দান করবে তার থেকে অনেক বেশি ফিরিয়ে পাবে। ধন ও জ্ঞান দেন করলে কখনো কমে যায় না, একদিন তোমার দান করা ধন ও জ্ঞান দ্বিগুন হয়ে তুমার কাছে এই ফিরে আসবে।

রাজা জীবনে শান্তি কি ভাবে পেলেন। এক রাজ্যে এক রাজা ছিলেন, তিনি সবসময় অশান্তিতে থাকতেন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি শান্তিতে থাকতে পারতেন না। একদিন এক গরিব ভিক্ষুক তার প্রসাদে আসে, ভিক্ষুকের জ্ঞান কথাবার্তাতে রাজা সন্তুষ্ট হন।

রাজা ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করেন, আমি রাজা আমার কাছে সবকিছু আছে তবুও আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না কেন। ভিক্ষুক বলে “রাজা আপনি একদিন একা বসে চিন্তা করুন, আপনার অশান্তির কারণ আপনি নিজেই খুঁজে পাবেন” এই বলে ভিক্ষু চলে গেল। তার পরদিন সকালে রাজা নিজের কক্ষে আসন করে বসে গেলেন। তখন রাজার মহলের এক কর্মচারী রাজার কক্ষ পরিষ্কার করতে আসে, রাজা সেই কর্মচারীকে তার কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করেন, কর্মচারীর কষ্টের কথা শুনে রাজা অনেক দুঃখিত হয়ে পরেন। তারপর তিনি তার মহলের প্রত্যেক কর্মচারীর কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন।

রাজা বুঝতে পারেন যে তার কর্মচারীরা বেতন কম থাকার কারণে জীবনে কষ্ট পাচ্ছে। তাই রাজা তার কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দিলেন, বেতন বাড়ানোর জন্য রাজার কর্মচারীরা খুশি হয়ে রাজাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং রাজার জয়ধ্বনি দিলেন।

কর্মচারীদের খুশি দেখে রাজার মনও সন্তুষ্টি ও খুশিতে ভরে যায়। তারপরদিন সেই ভিক্ষুক আবার রাজার কাছে আসে এবং রাজা কে জিজ্ঞাসা করে, “রাজা আপনি শান্তি পেয়েছেন” রাজা বলেন “পুরোপুরি তো শান্তি পাই নি কিন্তু যবে থেকে আমি মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ জানতে পেরেছি তখন থেকে আমার মন থেকে অশান্তি ধীরে ধীরে কম হচ্ছে।”

তখন ভিক্ষুক রাজাকে বলে “রাজা আপনি শান্তির পথ পেয়ে গেছেন, এখন কেবল এই পথ ধরে আপনাকে এগোতে হবে, একজন রাজা তখনি সন্তুষ্টি থাকে যখন তার রাজ্যে প্রজারা খুশি থাকে”।

এই গল্প থেকে আমরা এই শিক্ষা পেলাম, আমাদের মনের শান্তির জন্য নিজেকে খুশি করার চেয়ে, অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করে অন্যকে খুশি করলে নিজের জীবনে শান্তি ও খুশি পাওয়া যায়।

অস্থির মনকে স্থির করা

একবার গৌতম বুদ্ধ তাঁর কয়েকজন অনুসারীদের নিয়ে ভ্রমণ করছিলেন। পথে এক হ্রদ পড়লে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের একজনকে বললেন, “আমি তৃষ্ণার্ত। আমার জন্য হ্রদ থেকে কিছু জল আনো।”

শিষ্য হ্রদে গিয়ে পৌঁছানো মাত্র একটি গরুর গাড়ি হ্রদ অতিক্রম করতে শুরু করে। ফলে জলে ঘূর্ণন ওঠে এবং তা কর্দমাক্ত হয়ে যায়।

শিষ্য ভাবলো “এই জল আমি বুদ্ধকে কি করে পান করতে দেব?”

তাই তিনি ফিরে আসেন এবং বুদ্ধকে বলেন, “সেখানে জল খুব ময়লা। এটা পান করার উপযুক্ত না।”

প্রায় আধা ঘন্টা পর বুদ্ধ আবার একই শিষ্যকে যেতে বলেন লেকের দিকে, শিষ্য গিয়ে দেখলেন যে কাদা এখনও জমে গেছে। তিনি ফিরে আসেন এবং একই কথা বুদ্ধকে জানান। কিছুক্ষণ পরে, আবার বুদ্ধ শিষ্যকে জল আনতে যেতে বললেন। এই সময়, শিষ্য দেখলো, কাদা স্থির হয়ে গেছে, এবং জল পরিষ্কার। অতঃপর তিনি একটি পাত্রে কিছু পানি সংগ্রহ করে বুদ্ধর জন্য নিয়ে এলেন।

বুদ্ধ পানির দিকে তাকিয়ে শিষ্যকে বলেন, “দেখ, এই জল পরিষ্কার করার জন্য তুমি কি করেছ? কিছুই না । কেবল অপেক্ষা করেছ, আর কাদাগুলি নিজ থেকেই স্থির হয়ে নীচে জায়গামত ফিরে গেছে এবং তোমার আজলায় পরিষ্কার জল এসে গেছে।”

তোমার মনও ঠিক তেমন! যখন এটি অস্থির, অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হবে তখন শুধু মনকে একটু সময় দেবে। এটা নিজে থেকেই স্থির হবে।

আর এই অশান্ত মনকে শান্ত করার কোন প্রচেষ্টা বা জবরদস্তিরই প্রয়োজন নাই। এটি স্থির হবেই, কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই হবে।

তেমন তোমার প্রিয় মানুষ বা প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে ভেঙ্গে না পরে স্থির থাকা খুব কষ্টসাধ্য, জানি, কিন্তু অসম্ভব নয়।

প্রেমে পড়া তোমার নিয়ন্ত্রণে নাও থাকতে পারে, কিন্তু সেই প্রেম আঁকড়ে থাকা অবশ্যই নিশ্চিতভাবেই একটি পছন্দ মাত্র...(Falling in love might not have been under your control, but staying in love is definitely only a choice..)

সময় সবকিছু নিরাময় করে!! তাই যা তোমার কাছে এসেছে তা ইতিবাচক ভাবে দেখো এবং মন শান্ত করতে হলেও বিশ্বাস করো যে সব কিছুর জন্যই একটি উচ্চতর কারণ রয়েছে।

এমনকি উপরের সবগুলি কথাও যদি ভুল বলে মনে করো তবুও নিশ্চিত হবে যে একদিন তুমি বুঝতে পারবে এবং সেই দিন তুমি জানবে, যে আমি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছি।

আধারভেদে শিক্ষা

****

গৌতম বুদ্ধ তখন অহিংসার বাণী বিতরণ করছেন। এক সাপ এলো তার কাছে দীক্ষা নিতে। তিনি বললেন, না। তুমি মানুষকে দংশন করো। তোমার আচরণে, ধর্মে এখনো হিংসা বিদ্যমান। তুমি দীক্ষার উপযুক্ত নও। সাপ বলল, প্রভু, উপায় কি নেই কোনো? বুদ্ধ বললেন, আছে। দংশন করা ছাড়তে হবে। সাপ বলল, ছাড়লাম। বুদ্ধ বললেন, না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সাপ বলল, কী পরীক্ষা? তিনদিন লোকের সঙ্গে সদ্ভাব

বজায় রেখে সজ্জনের মতো ব্যবহার করতে হবে। দংশন করা যাবে না, গৌতম বুদ্ধ বললেন। তাই হবে, বলে সাপ প্রস্থান করলো।

এরপর শহরের সদর রাস্তায় সাপ শুয়ে থাকলো। তাই দেখে বাবাগো মাগো বলে লোকেরা পালাতে লাগলো। কাছে পিঠের এক সওদাগরকে ডেকে সাপ বলল, আমি বুদ্ধের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি তোমাদের উপকার করবো। সদ্ভাব বজায় রেখে জীবনধারণ করবো। বলো আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?

সওদাগর বলল, তাই কি হয়, সাপ কি সজ্জন হয়? যার বিষদাঁত থাকে সে কি কখনো মানুষের বন্ধু হয়? সাপ হেসে বলল, এই দেখ আমি বিষদাঁত তুলে ফেলেছি। আমি এখন তোমাদের বন্ধু। সওদাগর তখন হাসতে হাসতে বলল, বন্ধু, তবে তো একটা উপকার করতেই হচ্ছে। এই মালসামাল বয়ে নিয়ে যেতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। বাঁধবার জন্য কিছু দরকার। বলে সাপকে দড়ির মতো করে তার মালগুলো বেঁধে হাসতে হাসতে বাড়ির দিকে চলল।

এদিকে সাপের সাধনার কী অবস্থা দেখার জন্য বুদ্ধ ওই রাস্তার দিকে এলেন। এসে দেখেন সাপের অবস্থা খারাপ। চিঁড়ে চ্যাপটা অবস্থা। জিজ্ঞেস করলেন, এ অবস্থা কীভাবে? সাপ সব জানানোর পর বললেন, তা দংশন করতে মানা করেছি, কিন্তু ফোঁস করতে কি মানা করেছি?

বলল, আমি আমার শিক্ষা লাভ করেছি।

প্রথমত, যে যে কাজে স্বভাবতই পটু সেটা পালন করাই তার ধর্ম, এর অন্যথা অনাসৃষ্টি তৈরি করে সমাজে।

দ্বিতীয়ত, বেঁচে থাকার জন্য যে যে প্রকৃতির আশীর্বাদ পেয়েছে তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

তৃতীয়ত, নিজের সাধনার গুমোর অন্যের কাছে ফাঁস করা উচিত নয়। চতুর্থত, কুলগুরু ব্যতীত দীক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়।

বুদ্ধ বললেন, আর এই সমস্তটা মিলে তোমার কী মত?

সাপ বলল, প্রথমত, মন্ত্রচর্চা অপেক্ষা বাস্তবতার ভেতর প্রবেশ করে জ্ঞান লাভ উত্তম।

দ্বিতীয়ত, উত্তমগুরু শিষ্যকে যথাযথ আধারে (স্থানে) প্রেরণ করে নিজে থেকে জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করে স্বাবলম্বী করে তোলেন।

তৃতীয়ত, ধ্যানী, ধৈর্যশীলই কেবল এবং শেষপর্যন্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে।

গৌতম বুদ্ধ খুশি হয়ে বললেন, ‘তথাস্তু।’

ধৈর্যের ফল

****

একবার গৌতম বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা প্রচারের জন্য গ্রাম গ্রাম শহর শহর নিজের শিষ্যসহ পরিভ্রমণ করছিলেন, সারাদিন ভ্রমণের শেষে তথাগত খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন, জল পিপাসা এতই বেড়ে গেলো যে তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই তিনি তার একজন শিষ্যকে ডেকে বললেন যে তিনি ভীষণ পিপাসার্ত, সে যেন তাঁর জন্য জল নিয়ে আসে।

শিষ্য গুরুর আদেশে জল আনার জন্য গ্রামের ভিতরে গেলো, গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটি নদী বইছিল। কিন্তু সেই নদীতে গ্রামের সবাই কাপড় ধুচ্ছিল, কেউ গরু, মহিষ কে স্নান করাচ্ছিল, তাই নদীর জল অপরিষ্কার ছিল, তাই শিষ্য চিন্তা করলো এই জল তো অপরিষ্কার, তার গুরুদেবের জন্য এই অপরিষ্কার জল নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, তাই শিষ্য জল না নিয়ে খালি হাতে ফিরে এল। গৌতম বুদ্ধা যখন শিষ্যকে খালি হাতে চলে আসতে দেখলেন, তখন খালি হাতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন শিষ্য পুরো কাহিনী ব্যক্ত করল। এইদিকে তথাগত পিপাসায় কাতর, তিনি তখন আরেকজন শিষ্যকে জল আনার জন্য বললেন। সেই শিষ্য একটি মাটির পাত্রতে পরিষ্কার জল নিয়ে এল, তা দেখে গৌতম বুদ্ধ অবাক হয়ে গেলেন এবং সেই দ্বিতীয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে এই পরিষ্কার জল পেল কোথায়, কিভাবে।

দ্বিতীয় শিষ্য বলল যে সে যখন নদীর কিনারে জল আনার জন্য যায়, গিয়ে দেখে সবাই নদীতে কাপড় ধুচ্ছিলো, গরু, মহিষ কে স্নান করাচ্ছিল, সে নদীর কিনারে বসে গ্রামের সবার কাজ শেষ করার জন্য অপেক্ষা করছিল, সবাই কাজ কর্ম্ম শেষ করে যাওয়ার পর জলের উপরে থাকা ময়লা জলের নিচে বসার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। যখন ময়লা জলের নিচে বসে যায়, তখন জল নিয়ে আসে সে। শিষ্যের এই উত্তর শুনে গৌতম বুদ্ধ খুব খুশি হলেন এবং সব শিষ্যকে একটি উপদেশ দিলেন, যে জীবনে আমাদের যে কোনো কাজ ধৈর্য সহকারে করতে হয়, যে কোনো কাজ শুরু করে, প্রথম বারেই বিফল হয়ে কাজ ছেড়ে না দিয়ে আবার চেষ্টা করে যাওয়া উচিৎ, চেষ্টা করতে করতে একদিন সাফল্য আসবে, তাই চেষ্টা করে যাওয়া উচিত।

একই জ্ঞানের আধারভেদে অনেক প্রতিফলন

****

একদিন গৌতম বুদ্ধ এক সভাতে প্রবচন দিচ্ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ প্রবচন শেষ করার পর, যারা প্রবচন শুনতে এসেছিলেন তাদেরকে বললেন, “জাগো, সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।” প্রবচন শেষ করার পর গৌতম বুদ্ধ তার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বললেন “চলো আনন্দ একটু ঘুরে আসি।”

আনন্দ ও গৌতম বুদ্ধ এক সাথে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু আশ্রম এর মুখ্য দরজার সামনে এসে আনন্দ ও গৌতম বুদ্ধ দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন, কারণ যারা গৌতম বুদ্ধের প্রবচন শুনতে এসেছিলেন তারা ধীরে ধীরে একজন একজন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন আর দরজার মুখে ভিড় লেগে গিয়েছিল।

তাই আনন্দ আর গৌতম বুদ্ধ সবাইকে যেতে দেবার জন্য দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। হঠাৎ, সেই ভিড় থেকে একজন স্ত্রী এসে গৌতম বুদ্ধকে প্রণাম করলেন এবং বললেন, “ভগবান আমি একজন নর্তকী, আজ শহরের সভাপতির ঘরে আমার নৃত্যের অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু আমি আপনার প্রবচনে এসে নৃত্যের অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম।”

কিন্তু যখন আপনি বললেন যে, “জাগো, সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে”, তখন আমার অনুষ্ঠানের কথা মনে পরে যায়, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ঐদিন এক ডাকাতও এসেছিল গৌতম বুদ্ধের প্রবচন শুনবার জন্য। হঠাৎ ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে গৌতম বুদ্ধকে প্রণাম করে সে বললো, “ভগবান আমি আপনাকে মিথ্যে বলবনা, আমি একজন ডাকাত। আজ আমার এক জায়গায় ডাকাতি করার জন্য যাবার ছিল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু আপনার প্রবচন শেষ করার পর যখন আপনি বললেন যে, “জাগো, সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে”-তখন আমার মনে পড়ে গেল, যে আজ আমাকে ডাকাতি করতে যেতে হবে, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ভগবান।”

তারপর একজন বৃদ্ধ লোক ধীরে ধীরে এলেন এবং গৌতম বুদ্ধের কাছে এসে প্রণাম করে বললেন, “আমি পুরো জীবন,টাকা পয়সা, সুখ, পরিবার, জাগতিক সবকিছুর পিছনে ছুটেছি।”

জীবনে কোনো সমাজ সেবার কাজ করিনি, কিন্তু আজ আপনার প্রবচনের শেষে আপনি যখন বললেন, “জাগো, সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে”-তখন মনে হল যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি। এখন মনে হচ্ছে আমার জীবনটা বেকার কাটিয়েছি। আজ আপনার প্রবচনের শেষে আপনার ওই জেগে ওঠার কথায় আমার চোখ খুলে গেছে, আজ থেকে আমি সংসারের মোহ, মায়া ছেড়ে সংসারের ভালোর জন্য, সংসারের লোকের ভালোর জন্য কাজ করব”। এই বলে বৃদ্ধ প্রণাম করে চলে যায়।

যখন সবাই চলে গেলো, গৌতম বুদ্ধ তার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বললেন, “দেখো আনন্দ আমি প্রবচন একটি দিয়েছি কিন্তু তার অর্থ সবাই আলাদা আলাদা বের করেছে। যার যতটুকু ক্ষমতা সে ততটুকু এই দান গ্রহণ করতে পেরেছে। জ্ঞান অর্জন করতে গেলে তার মনকেও উপযুক্ত ভাবে তৈরি করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে গেলে মন পবিত্র আর আধার উপযুক্ত হওয়া দরকার।”

পিতৃধন, মহাজনপদ, ভার, জেতবন ও গন্ধকুটির, অঙ্গুলিমাল দমন কাহিনী,মূল্যপ্রাপ্তি, শহীদ শামুক ও অন্নদান।

পিতৃধন

*****

বুদ্ধত্ব লাভের এক বছর পরে শুদ্ধোধন তার পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমকে কপিলাবস্তু শহরে আমন্ত্রণ জানান। বোধিলাভের পরে তথাগত বুদ্ধের তাঁর পিতা শুদ্ধোধনের আমন্ত্রণে এখন কপিলাবস্তুতে আগমন। একদা রাজপুত্র গৌতম রাজধানীতে সংঘের সাথে ভিক্ষা করে খাদ্য সংগ্রহ করেন। কপিলাবস্তুতে অবস্থানকালে সিদ্ধার্থ

পত্নী যশোধরা তাঁর শিশুপুত্র রাহুলকে তথাগত বুদ্ধের দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তথাগত যশোধরাকে দর্শন দিতে অসম্মত হন। ব্যথিত যশোধরা অশ্রু বিসর্জন করে শেষে পুত্র রাহুলকে তথাগতের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। রাহুলকে তিনি বলেন তথাগতের কাছে পিতৃধন প্রার্থনা করতে। সেই মতো তথাগতের কাছে রাহুলকে নিয়ে উপস্থিত হন সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোধন। তার আগে আনন্দ ও অনুরুদ্ধ নামক তার দুইজন আত্মীয় তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাহুল তার জননীর ইচ্ছানুসারে পিতার কাছে পিতৃধন প্রার্থনা করলে বুদ্ধদেব তার পুত্র রাহুলকে তার নিকট বৌদ্ধ শ্রমণের দীক্ষাদান করেন এবং শিষ্য আনন্দ আর সারিপুত্তের হাতে রাহুলকে সমর্পন করেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে কপিলাবস্তু ত্যাগ করেন। যশোধরা রাহুলের মাধ্যমে সিদ্ধার্থকে গৃহাভিমুখী না করতে পেরে আর দুধের শিশু রাহুলকে হারিয়ে ভীষণ ভেঙে পড়েন এবং সিদ্ধার্থের পিতাও সেই শোকে শয্যা নেন এবং কিছুদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হন বিম্বিসারের আমন্ত্রণে মগধে।

মহাজনপদ

******

মগধ প্রাচীন ভারতে ষোলটি মহাজনপদ বা অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। এই ষোড়শ মহাজনপদগুলি হল: ‘কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, সুরসেনা, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ।’ ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে মগধ বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই রাজ্য বর্তমানের বিহারের পাটনা, গয়া আর বাংলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। রাজগৃহ ছিল মগধের রাজধানী। তারপর পাটলিপুত্রকে রাজধানি করা হয়েছিল। রাজা বিম্বসার ছিলেন মগধের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা। বুদ্ধদেবের আনন্দ, অনুরুদ্ধ, মহাকশ্যপ, সারিপুত্ত, মৌদ্গাল্যায়ন ও রাহুল ছাড়াও উপলি, পুণ্ণ, সুভূতি ও মহাকাত্যায়ন প্রভৃতি বুদ্ধের দশজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। এঁদের সকলকে নিয়ে বুদ্ধদেব রাজগৃহের বাইরে আম্রকুঞ্জে অবস্থান করছেন বেশ কিছুদিন, মহারাজ বিম্বিসার তাঁর পত্নীসহ রোজ আসেন বুদ্ধদেবের দর্শনে। একদিন নগরীর বেশ কিছু লোকজন নিয়ে এক শ্রেষ্ঠী এলেন বুদ্ধদেবের কাছে এবং তাঁরা বিনাশ্রমে মহারাজকে সম্মোহিত করে নিজেদের অন্নসংস্থান করছেন বলে প্রভূত অপমান করতে থাকেন বৌদ্ধসংঘের সকলকে। বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপ আর সারিপুত্ত তো তেড়ে মারতে গেছেন তাঁদের। বুদ্ধদেব সকলকে নিরস্ত করেন এবং সেই শ্রেষ্ঠীকে বোঝান যে তাঁরা শান্তি ও অহিংসার বাণী প্রচারের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, শ্রেষ্ঠী কিছু সময় পরে ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গের অন্য লোকেদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব যাত্রা করেন শ্রাবস্তীর দিকে।

ভার

***

গঙ্গার উত্তরে ছিল কোশল রাজ্য। এই রাজ্যেরই এক সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল শ্রাবস্তী। গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে শ্রাবস্তী নগরীর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। সুদত্ত ছিলেন শ্রাবস্তী নগরীর একজন ধনী শ্রেষ্ঠী। সুদত্ত ব্যবসায়ের কাজে মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরীতে গিয়েছিলেন। ওই রাজগৃহে নগরীতেই সুদত্ত প্রথম বুদ্ধকে দেখেছিলেন। বুদ্ধের সঙ্গে

কথা বলে সুদত্ত বুদ্ধের এক পরম ভক্তে পরিণত হয়। বুদ্ধকে একবার শ্রাবস্তী যাওয়ার অনুরোধ করেন সুদত্ত। বুদ্ধ রাজী হন। শ্রাবস্তীর কাছে এসে গিয়েও সারিপুত্ত ভুলতে পারছেন না মগধের সেই শ্রেষ্ঠীর অপমানের কথা,সেই প্রসঙ্গে তিনি যখন বুদ্ধদেবকে তাঁর উষ্মা প্রদর্শন করলেন বুদ্ধদেব তাঁকে বললেন, "ও, তুমি সেই অপমানের বোঝা বা ভার এখনো বয়ে বেড়াচ্ছ, আমি তো সেটা পরের মুহূর্তেই নামিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে গেছি কখন।" হতবাক সারিপুত্তকে বুদ্ধদেব বোঝালেন মান, অপমান, অভিমান, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগতাড়িত অনুভূতি সকল মনের ভার বা বোঝা বই আর কিছু নয়, যত শীঘ্র সেটি পরিত্যাগ করা যায়, ততো তাড়াতাড়ি ভারমুক্ত হওয়া যায়।

জেতবন ও গন্ধ কুটির

****

কিছুকাল পরের কথা। বুদ্ধ শ্রাবস্তী আসছেন; সঙ্গে কয়েক হাজার শিষ্য। এত লোককে কোথায় থাকবার আয়োজন করা যায়। সুদত্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রাবস্তী নগরীর বাইরে যুবরাজ জেত এর বিশাল একটি বাগান ছিল। সুদত্ত বাগানটি কিনতে চাইলে জেত প্রথমে রাজী হননি। পরে অবশ্য শর্তসাপেক্ষে রাজী হলেন– স্বর্ণমুদ্রায় সম্পূর্ণ বাগান ঢেকে দিতে হবে। সদুত্ত সম্মত হলেন। সুদত্ত গোশকট করে স্বর্ণমুদ্রা এনে বাগান ঢেকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুদত্তর পরম বুদ্ধভক্তি দেখে জেত অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি সুদত্তকে বাগানখানি দান করলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সুদত্ত জেত এর নামে বাগানে নাম রাখেন জেতবন।

বুদ্ধ শ্রাবস্তী এলেন। ধ্যান করলেন, দান করলেন; শ্রাবস্তী নগরীকে অমর করে রাখলেন। রাজকুমার জেত অসম্ভব ধনাঢ্য ছিলেন; তিনি বুদ্ধকে আঠারো কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করেন। সুদত্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুদত্ত অনাথদেরকে অন্ন (পিণ্ডক) দিতেন বলে তাঁকে অনাথপিণ্ডিক বলা হত। অনাথপিণ্ডিক নামটি বুদ্ধই দিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ব্যবহারের জন্য সুদত্ত গন্ধকাষ্ঠ দিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করেন, যা বৌদ্ধসাহিত্যে গন্ধকুটির নামে সুবিখ্যাত।

প্রাচীন শ্রাবস্তীর নগরীর দেয়াল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে তিনটি প্রাচীন স্থাপত্য দেখার জন্য আজও দেশবিদেশের পর্যটকেরা ভিড় করে–আঙ্গুলিমালা স্তুপ, অনাথপিণ্ডিক স্তুপ আর একজন জৈন তীর্থঙ্করের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাচীন জৈন চৈত্যগৃহ। আর রয়েছে জেতবন, গৌতম বুদ্ধের নিবাস গন্ধকুটির। জেতবনে রয়েছে আনন্দবোধি বৃক্ষ।

অঙ্গুলিমাল দমন কাহিনী

****

বুদ্ধ সমকালীন কোশল জনপদের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। ঐ কোশল জনপদের রাজা ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ। তাঁর রাজপুরোহিতের নাম ছিল ব্রাহ্মণ ভার্গব। চৌর-নক্ষত্রে তাঁদের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

তাঁর জন্মের সময় রাজার অস্ত্রাগারে হঠাৎ অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটে, ব্রাহ্মণ ভার্গব ছিলেন শাস্ত্রে পারদর্শী অশুভ নক্ষত্রে ছেলের জন্ম হওয়াতে তিনি গণনা করে জানতে পারলেন তাঁর ছেলে বড় হলে মানুষ হত্যা করবে। এবং রাজ্যে এক ভয়ানক পরিস্থিতিরর সৃষ্টি করবে। রাজ্যের মঙ্গল কামনায় ভার্গব ছেলেকে হত্যা করতে চাইলে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎতের হস্তক্ষেপে নবজাতক শিশুর জীবন রক্ষা পায়।

এবং কোশলরাজ ভার্গবকে বললেন, "অমঙ্গল আসলে কেউ ঠেকাতে পারবে না, এতে এই নবজাকের কি দোষ। বিপদ যখনি আসবে তখনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাকে উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বড় করা হোক।"

সম্ভাব্য দোষমুক্তি অবলম্বন করে তারা সন্তানের নামকরণ করেন "অহিংসক।" এ নামকরণের পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ শুভ নামের প্রভাবে এ সন্তান কারো প্রতি হিংসাভাব পোষণ করবে না। আবার তার প্রতিও কেউ হিংসা পোষণ করবে না। এ উপায়ে নরসংহার ও কোশল জনপদবাসীকে রক্ষা করা যাবে।

দিনে দিনে মাতাপিতা ও পাড়া-প্রতিবেশীদের স্নেহআদরে বড় হতে থাকে অহিংসক। তার স্বাভাবিক আচরণে চৌর-লগ্নে যে তার জন্ম সে কথা গণকদের ভবিষ্যবাণীর কথা সবাই ভুলে যেতে থাকে। বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে অহিংসক। বাল্যকাল কাটিয়ে উঠলে তার মাতাপিতা তাদের সন্তানকে শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করতে তৎকালীন বিখ্যাত আচার্যের নিকট শিক্ষা-দীক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অন্যান্য বাল্য-বন্ধুদের সাথে তক্ষশীলায় পাঠালেন। অল্প সময়ের মধ্যে অহিংসক লেখা-পড়ায়, খেলা-ধূলায়, তার বিনম্র চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে শিক্ষকগণের বিশেষত আচার্য ও গুরুমাতার মনে স্থান নিয়ে নেয়। অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় সে অধিক প্রিয়ভাজন হতে থাকে। আচার্যের ভালবাসায় শ্রাবস্তীর রাজপরিবারস্থ বন্ধু-বান্ধবরা অপেক্ষাকৃতভাবে অহিংসকের প্রতি ঈর্ষাভাব পোষণ করতে লাগলো। কোন কিছুতেই তাকে পরাজিত করতে না পেরে নিজেরাই তাদের ঈর্ষানলে জ্বলতে থাকে।

দিন যত যায় অহিংসক বুঝতে পারে তার বাল্য-বন্ধুরা সেই আগের মত নেই। আগের মত তাকে ভালভাবে খোলামেলা ভাবে গ্রহন করছে না। এদের এমন আচরণ দেখেও অহিংসক তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে নিজের লেখা-পড়ায় আরো অধিকতর মন দেয়। তার পরিপেক্ষিতে অহিংসকের প্রতি তার বন্ধুরা আরো অনেক বেশি ঈর্ষাপরায়ণ হতে থাকে। ঈর্ষানলের আগুনে থাকতে না পেরে এবার তারা অহিংসকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে শুরু করে। তার চাল-চলনের ব্যাপারে কুৎসা রটানো শুরু করে। শিক্ষকদের তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করতে থাকে। কিন্তু শিক্ষকরা অহিংসকের চাল-চলনে খুব খুশি। তাই তারা এগুলা মাথায় রাখেন না। এত কিছুর করার পরেও যখন কিছু করতে পারছে না তখন তারা নাছোড়-বান্দা হয়ে মাঠে নামে। এবার তারা দুরাচারী হবার অস্ত্র প্রয়োগ করেন। শেষ চালের অংশ হিসেবে তারা একে একে কয়েকবার গুরুমায়ের সাথে অহিংসকের অনৈতিক দৈহিক সম্বন্ধের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে আচার্যের কান ভারী করতে শুরু করে। গুরু প্রথমে এগুলো পাত্তা না দিলেও ক্রমশ তা দিনকে দিন বাড়তে থাকে। এদিকে আচার্য তার স্ত্রীর প্রতি দূর্বল ছিলেন। সবার মুখে এ কথা শুনে আচার্যের বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ক্ষুদ্ধ হন আর অহিংসকে কিভাবে আশ্রম হতে বিতাড়িত করা যায়, তার ফন্দি করতে থাকেন।

একদিন হঠাৎ আচার্য নির্দেশ প্রদান করলেন অহিংসক যেন এ আশ্রম থেকে চলে যায়। এ খবর পেয়ে মাতৃস্নেহে গুরুমাতাও খুবই কষ্ট পান। গুরুর অপ্রত্যাশিত নির্দেশে অহিংসক বড়ই ব্যথিত হয়। এ নির্দেশ প্রত্যাখান করার

মানসে গুরুর কাছে কাকুতি মিনতি করতে থাকে অহিংসক। এত কিছুর পরেও আচার্যের পাষাণ হৃদয় গলে নি। আচার্য ঈর্ষানলে এতটায় বশীভূত ছিলেন যে শুধু আশ্রম থেকে নয়, এমনকি তক্ষশীলা হতে আজীবন নির্বাসন হয় তার ব্যবস্থা করেন। অহিংসকের পীড়াপীড়িতে শেষমেষ আচার্য বলেন- ঠিক আছে এক শর্তে আমি তোমাকে রাখতে পারি। তখন অহিংসক স্ব-আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে ফেলে- যে শর্তই হোক না কেন আমি তা পূর্ণ করবো। আমায় আপনাদের স্নেহ-আদর হতে বঞ্চিত করবেন না গুরুদেব।

আচার্য বললেন–তোমাকে এর জন্য গুরু দক্ষিণা দিতে হবে ।
অহিংসক বলে–কি রকম দক্ষিণা বলুন, আমি দিতে রাজি আছি।
আচার্য–আমাকে এক হাজার মানুষের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল এনে দাও।

আচার্যের মুখে এমন বর্বর শর্ত শুনে হতবাক। এ সব শুনে অহিংসক বলে উঠলেন–গুরুদেব মানুষ হত্যা, এ তো মহাপাপ। আপনি আর অন্য যে কোন দক্ষিণার কথা বলুন! মনুষ্য হত্যা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমাকে ক্ষমা করুন।

অহিংসকের এমন কথা শুনে আচার্য বললেন–হ্যাঁ, এটা যে পাপ তা আমি মানি, কিন্তু গুরুর আদেশ অমান্য করা এটা কি পাপ নয়? যদি আমাকে সত্যিকারের গুরুদক্ষিণা দিতে চাও, তাহলে ঐ একহাজার বৃদ্ধাঙ্গুলি আমাকে উপহার দাও। যদি আমাকে ঐ একহাজার আঙ্গুলি এনে দাও তাহলে বিদ্যা-শিক্ষার বাকিটুকু শিক্ষাদান করবো। যাও এ মূহুর্তে এখান হতে বের হয়ে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।

অহিংসক আর কোন কথা না বলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ে।

তক্ষশীলার সীমানা পার হয়ে কোশল জনপদের সীমানায় পা রাখতেই চিন্তাই ভেঙ্গে পড়ে, এখন এ অবস্থায় কি করবে সে। গুরুকুল হতে বিতাড়িত হবার অপমান আর গুরু কর্তৃক এক হাজার মানুষের আঙ্গুল দক্ষিণা, এ সব কিছু ভাবতেই সে কষ্টের আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। এভাবে কয়েকদিন চললেও বিতাড়িত হবার অপমান এবং গুরুদক্ষিণা দেবার আদেশ তার সুন্দর কোমল মনকে দূষিত করে ফেলে। অহিংসকের হৃদয়ে হিংসার আগুন সঞ্চার হতে লাগলো। মানবের আর মানব সমাজের প্রতি তার হিংসার দাবানলের আগুন তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। আর অহিংসক হিংসকে রূপান্তরিত হয়ে সংকল্পবদ্ধ হলেন যে, গুরুদক্ষিণা দিয়ে অপমানের বদলা নেবে।

আঙ্গুল নিতে তো হত্যা করতে হবে। কিন্তু শ্রাবস্তীর লোকালয়ে থেকে ঐ ভয়ানক সংকল্প কখনোই পূরণ করা সম্ভব নয়। সেজন্যে অহিংসক লোকালয় ছেড়ে দিয়ে গভীর অরণ্যে অবস্থান গ্রহন করে। কিভাবে এই অপমানের বদলা, কিভাবে আবার গুরুকুলে গিয়ে তার বাকি শিক্ষা অর্জন, কিভাবে বাবা-মায়ের কাছে যোগ্য সন্তান হয়ে ঘরে ফিরে যাবে, সে চিন্তায়-দিনে একটা দুইটা করে মানুষ হত্যা করে তাদের আঙ্গুল মালা বানিয়ে গলায় ধারণ করতে লাগলো। ছেলে, বুড়া, নর-নারী কেউ আর তার হাত হতে রক্ষা পেত না। কেউ যদি পালিয়ে জীবন বাঁচাতে চাইতো তড়িৎ গতিতে ছুটে তাকে হত্যা করে আঙ্গুল কেঁটে নিত। সেই হতেই অহিংসক নাম পরিবর্তিত হয়ে অঙ্গুলিমাল রূপে পরিচিত লাভ করে। সবাই তার ভয়ে অন্যপথ দিয়ে যাতায়াত করতে

থাকে। বণিকেরাও তার ভয়ে অন্য রাস্তা ব্যবহার করতে থাকে। মানুষ যতই কমতে থাকে অঙ্গুলিমালও তার অবস্থান বদলাতে থাকে।

লোকমুখে শুধু একটিই নাম অঙ্গুলিমাল। তার কারনে কোশল রাজ্যে যাবার সব পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ে। এভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়াতে রাজ দরবারে গিয়ে সবাই বিক্ষোভ করতে লাগলো।

রাজা প্রসেনজিৎ ব্রাহ্মন ভার্গবকে তলব করেন, সে যেন অঙ্গুলিমালকে বুঝিয়ে নিয়ে আসেন। সবাই তার ভয়ে অস্থির। অঙ্গুলিমালের পিতা ভর্গব রাজাকে সরাসরি জবাব দেন–এমন কুলাঙ্গার, কলঙ্কিত পুত্র আমাদের প্রয়োজন নেই। রাজার যেমন ইচ্ছা তেমন করা হোক।

এদিকে কোশলবাসীর ক্ষোভের মুখে রাজা প্রসেনজিৎ তাঁর রজ্যের সেনাবাহিনীকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োজিত করেন। এবং তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়, যে কোন ভাবেই হোক, অঙ্গুলিমালকে জীবিত অথবা মৃত তার সামনে আনতে হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, অঙ্গুলিমালের মাথা কেটে আনা হোক।

এদিকে রাজা এ আদেশ রাজ্যের সমস্ত প্রান্তে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণাতেও অঙ্গুলিমালের কাজের মাত্রার কমতি নেই, বরং দিনকে দিন বাড়তে থাকে। এতদিনে তার গলায় আঙ্গুলের সংখ্যাও বেড়ে গিয়ে নয়শত নিরানব্বই। আর মাত্র একটি আঙ্গুল সংগ্রহ করতে পারলেই লক্ষ্য পূরণ। এদিকে মানুষের যাতায়াত কমে যাওয়াতে অঙ্গুলিমালের দুচিন্তার শেষ নাই, সে প্রলাপ বকতে থাকে–আর মাত্র একটি আঙ্গুল, আর মাত্র একটি আঙ্গুল যদি সংগ্রহ করতে পারি তাহলে আমার মন বাসনার পাশাপাশি গুরুদক্ষিণা দিয়ে গুরুর উপযুক্ত জবাব ও গুরুমায়ের স্নেহ-ভালবাসায় পুনঃ সিক্ত হব! যে কোন ভাবেই হোক আমার আঙ্গুল চাই চাই চাই।

অন্যদিকে অহিংসকের মা রাজার এ ঘোষনা শুনে ভয়ে তটস্থ। মায়ের মন ছেলের জন্য কাঁদতে থাকে, পুত্রের জীবন বাঁচাতে বৃদ্ধা মা ছুটে চললেন ছেলের সন্ধানে, পথে পথে তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সেনাবাহিনীর সেনারা তাকে আটকে রাখতে চাইলেও পারলো না। ছেলেকে খুঁজতে অরণ্যে ছুটেই চললেন। জনশূন্য হওয়াতে অঙ্গুলিমাল কোশল জনপদের বেশ কাছেই অবস্থান করছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর অবস্থান টের পেয়ে আবারো গভীর অরণ্যে চলে যায়। মা, বনের ভেতর প্রবেশ করতেই ডাকতে লাগলেন–অহিংসক, অহিংসক, আমার অহিংসক, তুমি কোথায় বাবা, একবার এ বৃদ্ধা মায়ের কাছে এসো, কতদিন দেখিনি তোমায়, তুমি কেমন আছ, কি খেয়েছ, কেমন দেখতে হয়েছ, এসো বাবা আমার কাছে এসো।

এভাবে যোজন, যোজন পথ অতিক্রম করতে করতে শ্রাবস্তী হতে তিন যোজন দূরে, জালিনী (জালি) বনে পৌঁছান।

এদিকে হঠাৎ মানুষের অবস্থান আর শব্দ শুনে অট্টহাসি হাসতে লাগলো–উ, হা,হা, হা। মায়ের মুখে অহিংসক নাম শুনে অঙ্গুলিমালের হৃদয় কিছুটা ব্যাকুল হলেও বহুদিনের পাওয়া থেকে বঞ্চিত আঙ্গুলের তীব্রপীড়া তাকে বিদারিত করে। এবং বলতে থাকে আজকে তার গর্ভধারণীকে হত্যা করে হলেও গুরু দক্ষিণা আমি দেবোই দেবো। আর বলতে লাগলো–কোথায় অহিংসক, এখানে কোন অহিংসক থাকে না, এখানে শুধু একমাত্র অঙ্গুলিমাল, সবাই আমাকে এই নামেই ডাকে। দেখছ না, আমার গলায় আঙ্গুলের মালা, এখানে নয়শত নিরানব্বইটি আঙ্গুল, আর মাত্র একটি আঙ্গুল দরকার। আবারো সেই ভয়ানক অট্টহাসি। তখন করুণা ঘন

আবেগের কণ্ঠে বৃদ্ধা মা বললেন–বাছা, অহিংসক, আমি তোমার মা, আমাকে চিনতে পারছিস না বাবা অহিংসক। অঙ্গুলিমাল অট্টহাসি দিয়ে উত্তর দেয়, কে মা, কার মা, আমি কাউকে চিনি না। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার আঙ্গুল। এই বলে খড়্গ উঁচিয়ে দৌড়াতে থাকে অঙ্গুলিমাল।

তথাগত বুদ্ধ তখন জেতবনে বিংশতম বর্ষাবাস যাপন করতেছিলেন। প্রতিদিনকার নিয়ম অনুসারে প্রত্যূষকালে শ্রাবস্তীর জেতবন-আরামে দিব্যদৃষ্টি বিস্তার করে ত্রিলোক অবলোকন করতে থাকেন।
তখনি দেখতে পেলেন অঙ্গুলিমাল ও তার বৃদ্ধা মাকে। বুদ্ধ আরো জানতে পারলেন–এ জন্মে যদি অঙ্গুলিমাল তার মাকে হত্যা করে, তাহলে মাতৃহত্যাজনিত ঘৃণিত পাপের কারনে অবীচি নরকে গমন করবে। এবং সাথে সাথে বুদ্ধ জানতে পারলেন, অঙ্গুলিমালের অরহত্বফল প্রাপ্তির সম্ভাবনাও আছে। মাতৃহত্যাজনিত পাপের ফলে অঙ্গুলিমালের জীবন ধংস এবং অপায়ে গমন করা হতে বিরত করতে করুণাবশতঃ মহাকারুণিক বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করে জালিনী বনে বৃদ্ধা মা এবং আঙ্গুলিমালের মাঝে উপস্থিত হন। অঙ্গুলিমাল ঠিক যখনি তার খড়্গ দিয়ে মাকে হত্যার পরিকল্পনা করতে থাকে তৎ মুহূর্তে বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে মাকে বাদ দিয়ে বুদ্ধকে হত্যার জন্যে ছুটে চলে।

অঙ্গুলিমালকে আসতে দেখে ভগবান বুদ্ধ তাঁর এমন ঋদ্ধি প্রয়োগ করলেন যাতে করে, অঙ্গুলিমাল দৌড়ালেও ভগবান বুদ্ধকে ধরতে না পারে। অঙ্গুলিমাল তার সমস্ত বল প্রয়োগ করেও বুদ্ধের কাছে পৌঁছাতে পারছিল না। শেষে ক্লান্ত হয়ে সে নুইয়ে পড়ে, এবং ভাবতে থাকে–এ কেমন মানুষ, কে এই শ্রমণ, আমি ধাবমান হরিণকে তৎক্ষনাৎ ধরতে পারি, অথচ এই শ্রমণকে কেন ধরতে পারছি না! শেষে আঙ্গুলিমাল দূর্বল হয়ে বলে–হে শ্রামণ, থামো, (কঠিন গলায়) থামো বলছি, আর এক পাও দৌড়াবে না!

বুদ্ধ–বৎস, আমি দৌড়াচ্ছি না, আমি তো স্থির; বরং তুমিই দৌড়াচ্ছো, তুমিই অস্থির। তুমিই থামো!

অঙ্গুলিমাল ভাবতে থাকে, এ আবার কেমন কথা, আমি এত দৌড় দিয়েও তাকে ধরতে পারলাম না আর শ্রমণ বলে কিনা সে স্থির। এটা কিভাবে সম্ভব, তখন আঙ্গুলিমাল বললো–হে শ্রামণ, আমার জানা মতে, শাক্য পুত্রগণ কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তুমি দৌড়াচ্ছো অথচ আমাকে বলছো তুমি স্থির। এর মানে কি?

বুদ্ধ–হে অঙ্গুলিমাল, সত্ত্বের কৃত কর্মের সংযোজনের দন্ড ত্যাগ করেছি। আমি স্থির আছি, কিন্তু আবাগমনের দন্ড নিয়ে তুমিই ধাবমান। আমি শান্ত আছি এবং স্থির। তুমিও স্থির হও। আমার ন্যায় শান্ত হও। তাই তোমাকে শান্ত এবং স্থির হতে পরামর্শ দিয়েছি।

অঙ্গুলিমাল এবার চিন্তা করলো কে এই শ্রমণ! এমন মধুর শব্দ আমি তো জীবনেও শুনি নাই, বুদ্ধের অমৃত বাণী শোনা মাত্রই তার সারা মন-মানসিক, মস্তিস্কে এক অদ্ভুত তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগলো। বোধশক্তি ফিরে পেয়ে ভাবতে লাগলো এ শ্রমণ কোন সাধারণ শ্রমণ নন। নিশ্চয়ই আমার কল্যাণে এই জনশূণ্য মহাঅরণ্যে আগমন করেছেন। তার হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। প্রাণী হত্যার কারণ সম্পর্কে অবগত হয়ে উৎসুক হয়ে বলে উঠে–হে শ্রামণ, আপনি কে?

বুদ্ধ–আমি তথাগত গৌতম বুদ্ধ।

বুদ্ধের মুখে বুদ্ধ শব্দ উচ্চারিত হতেই খড়্গ ফেলে দিয়ে বুদ্ধের পায়ে লুটিয়ে পড়ে মাথা নত করে আর্তনাদ করতে থাকে এবং বলতে থাকে–ভগবান আমাকে রক্ষা করতে আপনার এখানে আগমন। আমাকে রক্ষা করুন। তখন বুদ্ধ "এস ভিক্ষু" বলতেই পূর্বজন্মের কর্মের প্রভাবে ঋদ্ধিবলে পাত্র-চীবর দিয়ে অঙ্গুলিমালের উপসম্পদা সম্পন্ন হয়।

এরপর অঙ্গুলিমাল চীবর ধারন করে বুদ্ধের অনুগামী হন। উভয়ে শ্রাবস্তী ফিরে আসেন। ভগবান বুদ্ধ একে একে সব বিনয় কর্ম অঙ্গুলিমালকে অবহিত করেন। বুদ্ধের নির্দেশে ধ্যান-সমাধি ও বিনয় ধর্মে ব্রত হয়ে খুব অল্পদিনের মধ্যে অরহত্ব-ফল লাভ করেন।

এদিকে রাজা প্রসেনজিৎ তাঁর দূতের মাধ্যেমে জানতে পারলেন যে অঙ্গুলিমাল শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করেছে। তখন রাজা প্রসেনজিৎ অঙ্গুলিমালকে দমন করার জন্য নিজে এবং সসৈন্য-সামন্ত নিয়ে রওনা হলেন। ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় ভগবান বুদ্ধের দর্শন লাভ করার জন্য জেতবনে প্রবেশ করেন। বুদ্ধের পাশে তখন অঙ্গুলিমাল উপস্থিত আছেন। রাজাকে যুদ্ধের পোশাকে দেখে ভগবান বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন–মহারাজ এত হতাশাগ্রস্থ হয়ে সসৈন্য নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? কোথাও কোন যুদ্ধ আছে নাকি? উত্তরে রাজা প্রসেনজিৎ বললেন- ভগবান, আমার রাজ্যে এখন শুধু একটায় দুশ্চিন্তা, আর সেটা হল অঙ্গুলিমাল। ঐ অঙ্গুলিমালকে যদি বশে আনতে পারতাম তাহলে আমি দুশ্চিন্তা মুক্ত হতাম। শুনলাম শ্রাবস্তীর আশেপাশে অঙ্গুলিমাল অবস্থান করছে, তাই নিজ হাতে থাকে দমন করার জন্যে আমি সশরীরে এসেছি।

মহারাজের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে ভগবান বুদ্ধ আর্শীবাদ প্রসঙ্গে বলেন–মহারাজ, কোশলবাসীর হিতার্থে যদি ঐ অঙ্গুলিমাল আপনার নিকট এসে ধরা দেয়, তবে আপনার অনুভুতি কি হবে?

রাজা প্রসেনজিৎ–যাকে আমার হাজার হাজার সৈন্য ধরে আনতে পারে নি, সে কি নিজে এসে ধরা দিবে? এ অসম্ভব।

এবারে বুদ্ধ বললেন–মহারাজ যদি ঐ অঙ্গুলিমালকে সংসার ত্যাগ করা অবস্থায়, চীবর ধারন করা অবস্থায়, ভিক্ষু রূপে দেখেন তখন কি করবেন?

রাজা প্রসেনজিৎ–ভগবান, আমি নিজ হাতে থাকে চীবরাদি পূজা করবো।

ভগবান বুদ্ধ–তখন ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের দিকে আঙ্গুল দিয়ে সংকেত দিয়ে বললেন–মহারাজ, এনিই অঙ্গুলিমাল।

অঙ্গুলিমাল!! রাজা নাম শুনতেই বসা অবস্থায় দাঁড়িয়ে যান। রাজার গলার স্বর কেঁপে উঠল, কপাল দিয়ে ঘাম বেরোতে লাগলো। তখন রাজা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো–এ কি করে সম্ভব। যাকে আমার হাজার হাজার সেনাবাহিনী ধরতে পারে নি, তাকে কি করে ভগবান বুদ্ধ বিনা অস্ত্রে ধরে আনলেন, তাও আবার ভিক্ষু রূপে। এ ঘটনা রাজার নিজের চোখে বিশ্বাস হচ্ছে না, এদিকে আবার ভগবান বুদ্ধের কথাকেও তো অবিশ্বাস করা যায় না। শেষে নিজে গিয়ে নতমস্তকে বুদ্ধকে এবং বুদ্ধের অনুগামী শিষ্য অঙ্গুলিমালকে নতশিরে বন্দনা করলেন।

আর নিবেদন করলেন–ভন্তে, আজ হতে আপনার চতুর্প্রত্যয় দানের ভার আমার। প্রত্যুত্তরে অঙ্গুলিমাল বলেন–মহারাজ, আমি তথাগতের নির্দেশে ধুতাঙ্গ শীল পালন করছি, চতুর্প্রত্যয় দাতার প্রয়োজন নেই। অঙ্গুলিমালের মুখে এ সব কথা শুনে এবং সুশীল ভিক্ষুরূপে দস্যু অঙ্গুলিমালকে পেয়ে তাকে হত্যা করে আনার দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে রাজ্যে ফিরে আসার অনুমতি প্রদান করেন । মহাকারুণিক বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাজা রাজমহলে ফিরে যায়।

এ অল্প সময়ের মধ্যে শ্রাবস্তীবাসীর কাছে এ খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। অঙ্গুলিমাল ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়েছেন। ধুতাঙ্গ-ব্রতধারী ভিক্ষু হয়ে তিনি শ্রাবস্তী-বাসীর দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করেন। যখন অঙ্গুলিমাল ভিক্ষায় বের হন, তখন কেউ কেউ ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেন, আবার কেউ কেউ দরজা-জানালা আধ খোলা অবস্থায় অঙ্গুলিমালকে দেখতে চান। স্বাভাবিক ভাবে নয়শত নিরানব্বই মানুষ হত্যাকারিকে কে না দেখতে চায়!! নিরস্ত্র ভিক্ষুর বেশে অঙ্গুলিমালকে দেখে অনেকে চমকে যান, আবার যাদের স্বজন অঙ্গুলিমালের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, তাদের স্বজনেরা ভিক্ষা দেওয়ার বদলে, ক্ষোভে ভিক্ষা না দিয়ে ইঁটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। ইঁটের খন্ড অঙ্গুলিমালের মাথায়, শরীরে জখম করে তাকে রক্তাক্ত করে দেয়। ভাঙ্গা ভিক্ষা পাত্র ও রক্তাক্ত শরীর নিয়ে জেতবনারামে চলে আসেন। বিহারে আসার পর ভগবান বুদ্ধকে বিস্তারিত বলেন।

ভগবান সব শুনে উপদেশ দিয়ে বললেন–হে অঙ্গুলিমাল, নয়শত নিরানব্বই জন নিরাপরাধ মানুষের হত্যাজনিত পাপের ভয়ানক নারকীয় যাতনার তুলনায় এ যাতনা অতি সাধারণ। সহনশীলতা বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমা দিয়ে মানবতার পরিচয় দেবার উপদেশ প্রদান করেন ভগবান বুদ্ধ।

ভগবান বুদ্ধের নির্দেশ মত অঙ্গুলিমাল ক্ষুদ্ধ জনতার ক্ষোভ-জনিত সব ধরনের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকেন। এভাবে কিছুদিন গত করার পর ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার হতে থাকে।

অঙ্গুলিমালের এত সুন্দর পরিবর্তন দেখে নগরবাসী মুগ্ধ হয়ে ইঁটপাটকেল ছোঁড়ার পরিবর্তে ভিক্ষাপাত্রে পিন্ডপাত দান দিতে শুরু করেন।

এভাবে দিনে দিনে অঙ্গুলিমাল সবার ভালবাসায় সিক্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন।
একদিন শ্রাবস্তীর এক কুটির হতে একজন নারীর করুণ আর্তনাদ শুনতে পান অঙ্গুলিমাল। কারন জানতে ভিতরে প্রবেশ করে অঙ্গুলিমাল। গিয়ে জানতে পারেন যে নারীটা গর্ভবতী। প্রসব বেদনায় চটপট করতেছে। নারীর এমন করুণ আর্তনাদ শুনে অঙ্গুলিমালের হৃদয়ে করুণাবশত ভালবাসার সঞ্চার হল, দৌড়ে ছুটে এলেন ভগবান বুদ্ধের কাছে, তারপর ভগবান বুদ্ধকে ঐ নারীর প্রসব বেদনা সম্পর্কে অবহিত করে বললেন যে কি উপায়ে ঐ নারীর প্রসব বেদনা দুর করা যায়।
তখন বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে সত্যক্রিয়া করতে বলেন–প্রতি উত্তরে অঙ্গুলিমাল জানতে চাই কি উপায়ে সত্যক্রিয়া করা যায়?

ভগবান বুদ্ধ বললেন–কোন একটা ঘটনাকে নিয়ে অধিষ্ঠান করতে হয়।

অঙ্গুলিমাল–আমাকে শিখিয়ে দিন কিভাবে তা করতে হয়।

ভগবান বুদ্ধ–এ জীবনে আমি একটি প্রাণীরও জীবন হত্যা করি নি, একথা যদি সত্যে হয় তাহলে ঐ সত্যের প্রভাবে ঐ গর্ভবতী নারীর প্রসববেদন দূর হোক। এবং সুস্থ সুন্দর ভাবে বাচ্চা প্রসব হোক।

অঙ্গুলিমাল–আমি এ নিষ্ঠাবান সত্যক্রিয়া করতে পারবো না, অতীত জন্মের কথা বাদ দেন, এ জন্মে আমি নয় শত নিরানব্বই জন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেছি। এর দ্বারা আমার সত্যক্রিয়া হবে না।

তখন বুদ্ধ বললেন–তাহলে এভাবে বলতে পারো যে–আমি বুদ্ধের শরণনাপন্ন হবার পর থেকে একটি প্রাণীও হত্যা করিনি, এ সত্যের প্রভাবে ঐ গর্ভবতী নারীর প্রসববেদন দূর হোক। এবং সুস্থ সুন্দর ভাবে বাচ্চা প্রসব হোক।

উত্তরে অঙ্গুলিমাল বললেন–ভগবান বুদ্ধ, এ কথা বলতে আমর কোন আপত্তি নেই। কারন এই কথাটা অতীব সত্য।

বুদ্ধ–আয়ুষ্মান, যাও এবার ঐ নারীর কাছে গিয়ে তোমার এ সত্যক্রিয়া কর।

ভগবান বুদ্ধের আদেশে অঙ্গুলিমাল কালবিলম্ব না করে ঐ গর্ভবতী নারীর কুটিরের পাশে একটি পাথরে বসে বুদ্ধের নির্দেশ মত সত্যক্রিয়া করেন এই ভাবে–

“যতোহং ভগিনী, অরিয়ায় জাতিয়া জাতো,
নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা,
তেন সচ্চেন সোথিথ তে হোতু গব্ভস্স”

অনুবাদ: হে ভগিনী বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়ে আর্যজাতিতে অহর্ৎ হবার পর থেকে সজ্ঞানে আমি একটি প্রাণীও হত্যা করি নি। যদি এ কথা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এ সত্যের প্রভাবে আপনার প্রসব–বেদনা অচিরেই দূর হোক।

অঙ্গুলিমাল অধিষ্ঠান শেষ করতেই ঐ গর্ভবতী নারীর প্রসব-বেদনা দূর হয়। এবং একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এ ঘটনার পর অঙ্গুলিমাল খুবই আনন্দিত হন। এবং সত্যক্রিয়ার যে মহৎফল সেটা ভাবতে ভাবতে আনন্দিত হয়ে বিহারে এসে ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে সব কথা খুলে বলেলেন।

এদিকে এ কথা শ্রাবস্তীর অলিতে-গলিতে লোক-জনের মুখে মুখে যে-অঙ্গুলিমালের সত্যক্রিয়ার প্রভাবে এক গর্ভবতী নারীর প্রসব-বেদনা দূর হয়ে ঐ মহিলা একটি পুত্র সন্তান জন্মদান করেন।
সবাই অঙ্গুলিমারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এর পর হতেই এ সত্যক্রিয়া বৌদ্ধ সমাজে “অঙ্গুলিমাল-পরিত্তং” নামে খ্যাতি অর্জন করে।

মূল্যপ্রাপ্তি

******

অঘ্রাণ মাসের এক হিমেল রাত্রি, বুদ্ধদেব অবস্থান করছেন গন্ধকুটিরে রাজা প্রসেনজিতের রাজ্যে। মালী সুদাসের কুটিরের সংলগ্ন সরোবরে বেশিরভাগ পদ্মপুষ্প মৃতবৎ, শুধু একটি পদ্ম পূর্ণ প্রস্ফুটিত। সুদাস সেটি তুলে নিয়ে বেশ কিছু অর্থলাভের আশায় চলেছে রাজা প্রসেনজিতের রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে। প্রাসাদ ঢোকার কিছু আগে এক পথিকের সঙ্গে সুদাসের দেখা হলো, সে বুদ্ধদেবের সেবায় নিবেদন করবে বলে সুদাসের কাছে পদ্মটি ক্রয় করবার জন্য তার মূল্য জানতে চাইলে সুদাস তাকে বলল যে সে এক স্বর্ণমুদ্রা মূল্য নেবে এটির যেহেতু এটি অসময়ের পদ্ম। পথিক সেটি নেবার আগেই সেস্থলে উপস্থিত হলেন মহারাজ প্রসেনজিৎ। তিনি পদ্মটি নিতে চাইলে সুদাস জানাল যে সেটি ঐ পথিক এক স্বর্ণমুদ্রায় নেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন, শুনে মহারাজ প্রসেনজিৎ বললেন তিনি দশ স্বর্ণ মুদ্রা দেবেন, মহারাজ প্রসেনজিৎও পদ্মটি বুদ্ধদেবের চরণে নিবেদনের পিয়াসী। সেই পদ্মটির দাম নিয়ে পথিকের সঙ্গে যখন মহারাজ প্রসেনজিতের বচসা উপস্থিত হলো, তখন সুদাস ভাবল যাঁকে দেওয়ার জন্য দুজনেই এতো মূল্য দিতে আগ্রহী, না জানি তাঁকে দিলে আরো কত বেশি লাভ হবে, সে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে জানাল যে সে পদ্মটি বিক্রয় করবে না এবং ছুটলো জেতবন সংলগ্ন গন্ধকুটিরে যেখানে ভগবান তথাগত অবস্থান করছেন। নিরঞ্জন আনন্দমূর্তি তথাগত পদ্মাসনে বসে আছেন, দৃষ্টিতে তাঁর শান্তি ঝরে, স্মিত মুখে করুণার সুধাঝরা হাসি। অপলক নয়নে নির্বাক হয়ে বহুক্ষণ চেয়ে থেকে সুদাস সেই পদ্মটি তাঁর পাদপদ্মে রেখে দিল। ভগবান তথাগত তাঁর অমৃতবর্ষী হাসি হেসে সুদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, “বৎস, তোমার প্রার্থনা কি?” সুদাস ব্যাকুল স্বরে জানাল, “আপনার চরণের এক কণা ধূলি ছাড়া আর কোনো প্রার্থনা আমার নেই, প্রভু।” বুদ্ধদেব তাকে আশ্রয় দান করলেন।

শহীদ শামুক ও তাদের ত্যাগ স্মরণ

****

আমরা সাধারণত গৌতম বুদ্ধের যে মূর্তি/ছবিগুলো দেখি, তাতে তাঁর মাথায় গোল গোল কোঁকড়ানো চুল/চুলের মত বস্তু দেখতে পাই।সত্যি কি এগুলো তাঁর মাথার চুল, না অন্যকিছু?
সংসার ত্যাগের সময় তিনি মাথা মুড়িয়ে নেন। তাহলে এগুলো কি?

এর পিছনে একটি প্রচলিত কাহিনী রয়েছে.....

একদিন গৌতম বুদ্ধ গাছের নীচে বসে ধ্যান শুরু করলেন। তিনি চিন্তায় এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে সময় গড়িয়ে দুপুর হল সেটি তার নজরে পড়েনি। সময় যত গড়াচ্ছিল ততই সূর্যের রশ্মি তাঁর চুলহীন মাথায় পরতে থাকে।

সেই মুহূর্তে, একটি শামুক গৌতম বুদ্ধর সামেনে দিয়ে যাচ্ছিল। শামুক খেয়াল করল যে বুদ্ধ সেই প্রচণ্ড গরমে ধ্যান করছেন। যদিও তিনি গাছের নীচে বসে ছিলেন, তবুও সূর্যের রশ্মিগুলি তাঁর মাথার ওপর পরছিল। শামুক ভেবেছিল এই প্রচণ্ড গরমে ধ্যানে মনোনিবেশ করা তার পক্ষে কঠিন হবে।

দ্বিতীয় বার না ভেবেই শামুক বুদ্ধের মাথার উপরে উঠে বসে, এই ভেবে যে তার ঠাণ্ডা শরীরটি বুদ্ধের মাথার মসৃণ ত্বককে ঠান্ডা রাখবে। অন্যান্য শামুকও প্রথম শামুক কে অনুসরণ করে বুদ্ধের মাথায় গিয়ে বসে। এই শামুক গুলি দেখে মনে হচ্ছিল যেন বুদ্ধের মাথায় কোন পেঁচানো খোলসের টুপি।

শামুকের শীতল এবং স্যাঁতসেঁতে দেহগুলি কয়েক ঘন্টা অবধি বুদ্ধের ধ্যান বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল। শামুক গরম রশ্মির কারণে তাদের দেহ শুকিয়ে গেছিল। পরে সন্ধ্যায় বুদ্ধের যখন ধ্যান ভাঙ্গলো, তখন তিনি জানতে পারলেন যে ১০৮ টি শামুক তাঁর মাথায় ওপর ছিল, প্রত্যেকেই তাদের জীবন দিয়েছিলেন বুদ্ধের জ্ঞানার্জনের পথে বিঘ্ন মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে।
শামুকগুলি যেহেতু বুদ্ধের জন্য তাদের জীবন দিয়েছিল তাই তারা এখানে শহীদ হিসাবে সম্মানিত। তাদের ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এগুলি বুদ্ধ মূর্তিতে প্রদর্শিত হয়।

অন্নদান

»»»»»»»

প্রেক্ষাপট

*****

বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত ষোড়শ জনপদের একটি ছিল মগধ, যার রাজা অজাতশত্রু ছিলেন হর্য্যঙ্ক রাজবংশের রাজা বিম্বিসার ও কোশল রাজকন্যা চেলেনার পুত্র । ৯২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গৌতম বুদ্ধের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ বৌদ্ধ ভিক্ষু দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বিম্বিসারকে হত্যার চেষ্টা করেন। বুদ্ধের মতাদর্শে বিশ্বাসী বিম্বিসার এই ঘটনায় তাঁর পুত্রকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পুনরায় দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু বিম্বিসার ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীকে গৃহবন্দী করে নিজেকে মগধের শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ৪৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গৃহবন্দী অবস্থায় বিম্বিসারের মৃত্যু ঘটে। এই সময় দেবদত্তের প্ররোচনায় তিনি গৌতম বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করেন। পিতার মৃত্যুর পর অনুশোচনায় দগ্ধ অজাতশত্রু শান্তিলাভের আশায় বিভিন্ন ধর্ম উপদেষ্টা ও দার্শনিকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাঁদের উপদেশে শান্তিলাভে ব্যর্থ হয়ে রাজবৈদ্য জীবকের উপদেশে গৌতম বুদ্ধের শরণাপন্ন হলে বুদ্ধ তাঁকে সাম্যফলসুত্ত ব্যাখ্যা করেন।

কোশলের সঙ্গে যুদ্ধ

****

বিম্বিসারের বন্দীত্ব ও মৃত্যুর ঘটনায় ক্রুদ্ধ কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একদা উপহার হিসেবে প্রদত্ত কাশী রাজ্য পুনরায় নিজের অধীনে নিয়ে নিলে অজাতশত্রু কোশল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথম যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হলেও পরের যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রসেনজিৎ তাঁকে মুক্ত করেন এবং তাঁর কন্যা বজিরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়ে যৌতুক হিসেবে কাশী রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

গঙ্গার উত্তরে ছিল কোশল রাজ্য, এটিও বৌদ্ধ সাহিত্যের ষোড়শ জনপদের আর একটি। এই রাজ্যেরই এক সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল শ্রাবস্তী। গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে শ্রাবস্তী নগরীর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। সুদত্ত ছিলেন শ্রাবস্তী নগরীর একজন ধনী শ্রেষ্ঠী যিনি ব্যবসায়ের কাজে মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরীতে গিয়েছিলেন। ওই রাজগৃহ নগরীতেই সুদত্ত প্রথম বুদ্ধকে দেখেছিলেন এবং বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলে তাঁর এক পরম ভক্তে পরিণত হন। বুদ্ধকে একবার শ্রাবস্তী যাওয়ার অনুরোধ করেন সুদত্ত। বুদ্ধ রাজী হন। কিছুকাল পরের কথা। বুদ্ধ শ্রাবস্তী আসছেন; সঙ্গে কয়েক হাজার শিষ্য। এত লোককে কোথায় থাকবার আয়োজন করা যায় ভেবে সুদত্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রাবস্তী নগরীর বাইরে যুবরাজ জেত এর বিশাল একটি বাগান ছিল। সুদত্ত বাগানটি কিনতে চাইলে জেত প্রথমে রাজী হননি। পরে শর্তসাপেক্ষে রাজী হন–স্বর্ণমুদ্রায় সম্পূর্ণ বাগান ঢেকে দিতে হবে। সুদত্ত সম্মত হলেন। সুদত্ত গোশকট করে স্বর্ণমুদ্রা এনে বাগান ঢেকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সুদত্তর পরম বুদ্ধভক্তি দেখে জেত অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি সুদত্তকে বাগানখানি দান করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সুদত্ত জেত এর নামে বাগানের নাম রাখেন জেতবন।

বুদ্ধ শ্রাবস্তী এলেন। ধ্যান করলেন, দান করলেন; শ্রাবস্তী নগরীকে অমর করে রাখলেন। রাজকুমার জেত অসম্ভব ধনাঢ্য ছিলেন; তিনি বুদ্ধকে আঠারো কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করেন। সুদত্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুদত্ত অনাথদেরকে অন্ন (পিণ্ডক) দিতেন বলে তাঁকে অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ বলা হত। অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ নামটি বুদ্ধই দিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ব্যবহারের জন্য সুদত্ত গন্ধকাষ্ঠ দিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করে দেন ‘গন্ধকুটির’ নামে যেটিতে বুদ্ধদেব অবস্থান করতেন।

আখ্যান

****

অজাতশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের ফলস্বরূপ কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নগরীর জনগণকে রক্ষা করার অপরূপ ঘটনাটি এই আখ্যানের উপজীব্য। অনাথপিণ্ডদ সুদত্ত কন্যা সুপ্রিয়াও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেন এবং তথাগতের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেই দুর্ভিক্ষ কবলিত শ্রাবস্তীর এক সন্ধ্যায় বুদ্ধদেব তাঁর প্রত্যেক ভক্তগণের কাছে গিয়ে জনে জনে জানতে চাইলেন যে কে ক্ষুধিতের অন্নদান সেবার ভার নিতে ইচ্ছুক। শ্রাবস্তীর ধনবান শ্রেষ্ঠী তথাগতের পরমভক্ত রত্নাকর শেঠ প্রথমে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে হাত জোড় করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, “প্রভু, মার্জনা করুন, এই ক্ষুধার্ত বিশাল পুরীর ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতা আমার নেই।” শ্রাবস্তীর সামন্ত রাজা তথাগতভক্ত জয়সেন বললেন, “প্রভু আপনার আদেশ মাথা পেতে নিতাম যদি আমার বুক চিরে রক্ত দিলে সেটা কোনো কাজে আসত, আমি অপারগ, আমার ঘরে কোথায় অন্নের সংস্থান আছে আজ?” ধর্মপাল নামে আরেক সম্পন্ন কৃষক বুদ্ধভক্ত বললেন, “কি আর বলব প্রভু, আমার এমন পোড়া কপাল যে আমার অমন সোনার খেত যেন অজন্মায় পালিত প্রেতের মত ধুঁকছে, রাজকর দেওয়াই কঠিন হয়ে গেছে, আমি অক্ষম, দীনহীন হয়ে গেছি।” সেই সভাঘরে সকলে একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, কারো মুখে কোনো উত্তর নেই, ব্যথিত শ্রাবস্তী নগরীর নির্বাক সেই সভাগৃহে তথাগতের করুণ দুটি নয়ন সন্ধ্যার ম্রিয়মান তারার মত চেয়ে রইল সবার দিকে। তখন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো লজ্জারক্তিম আননে অনাথপিণ্ডদের কন্যা

সুপ্রিয়া, যিনি বুদ্ধদেবের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে বুদ্ধদেবের পদস্পর্শ করে চরণধূলি মস্তকে নিয়ে বললেন, “আমি ভিক্ষুণীরও অধম সুপ্রিয়া, আমি প্রভুর আজ্ঞা মাথা পেতে নিলাম, খাদ্যহারা যারা কাঁদছে, তারা আমার সন্তান, নগরীতে অন্ন বিতরণ করার ভার আমি নিলাম।” সকলে বিস্মিত হয়ে বলল, “তুমি ভিক্ষুকন্যা, নিজেও তুমি ভিক্ষুণী, কোন অহংকারে মেতে মাথা পেতে এমন গুরু দায়িত্বের কাজ নিচ্ছ?” সুপ্রিয়া বলল, “আমি দীনহীন মেয়ে, সবার চেয়ে অক্ষম, তাই নিশ্চয় তোমাদের দয়া পাব, প্রভুর আজ্ঞা বিজয়ী হবে, ক্ষুধার্ত অন্ন পাবে। আমার ভান্ডার ভরে আছে তোমাদের সকলের ঘরে ঘরে, আমার শুধু এই ভিক্ষা পাত্র আছে, তোমরা চাইলে সেই ভিক্ষা পাত্র অক্ষয় হবে, ভিক্ষার অন্নে ধরণীকে বাঁচাব, দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটাবো।” তথাগতের আশীর্বাদ নিয়ে অনাথপিণ্ডদ সুতা সুপ্রিয়া তাঁর মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হল এবং অন্নদানে ক্ষুধিতকে জীবনদান করল। সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্রীর কর্মের মধ্যে দিয়ে মহৎ হৃদয়ের ধারাটি অব্যাহত রইল।

বুদ্ধদেবের জীবনী, সপ্তপদ্ম সুজাতা ও আনন্দ

বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

****

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ কেবল মাত্র যে একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেনতা নয়, তিনি একজন মহান দার্শনিক ছিলেন। বহুবিধ ঐতিহাসিক গবেষণা ও পর্যালোচনা এর মাধ্যমে আমরা তার জীবন সম্পর্কে নানান তথ্য সূত্র লাভ করেছি। বুদ্ধদেব জানিয়েছেন, কিভাবে মানুষ তার জীবনে শান্তি পেতে পারে। এই শান্তির জন্য দরকার অহিংসা, সত্যবাদিত, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সাম্যবোধ। আজো এই পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও অনুরাগীর সংখ্যা অসংখ্য আমরা ভাগ্যবান যে গৌতম বুদ্ধ আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন।

যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৫৬৩ বছর আগে নেপালের নিকটবর্তী কপিলাবস্তুতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। তার পিতা ছিলেন কপিলাবস্তুর নৃপতি শুদ্ধোধন এবং মাতা মায়াদেবী। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর জন্ম।

বাল্যকালে তার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। খুব কম বয়সেই তিনি তার মাতা মায়াদেবীকে হারান। তার বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁর লালন-পালনে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাই সিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতম। আবার তিনি শাক্য বংশের সন্তান ছিলেন বলে তাকে বলা হয় শাক্যমুনি।

যৌবনে তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন। তার স্ত্রীর নাম যশোধারা। যশোধারাকে গোপা নামেও অভিহিত করা হতো।

ছেলেবেলা থেকেই গৌতম ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। সর্বক্ষণই মানুষের দুঃখ ও বেদনার ভাবনাতে আত্মমগ্ন। পরমপুরুষের নিকট তার একটাই নিবেদন-মানুষ কিভাবে এই দুঃখ, বেদন, গ্লানি ও হতাশা থেকে মুক্তি পাবে তার উপায়কে জানাতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মের মর্মকথা আমাদের দেশের সভ্যতা ও ধর্মবোধে প্রাচীন কাল থেকেই উপস্থিত ছিল। বুদ্ধদেব তার নব সংহতরূপ প্রদান করেন। বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা বলেছেন ভগবান বুদ্ধ এর আগে আরো পঞ্চান্নবার এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধ হলেন তার শেষ আবির্ভাব। প্রতিবারই তিনি মানুষের কল্যাণ করে গেছেন উৎসাহ ও উপদেশ ও আশীর্বাদ এর মাধ্যমে। ললিত বিস্তার গ্রন্থে আদি বুদ্ধদেবের নাম আমরা পেয়েছি।

তাঁর আগের জন্মগুলিতে যে নামে পরিচিতি পান তাঁরা হলেন পদ্দত্তোর, ধারমোকেতু, দীপঙ্কর, গুনকেতু, মহাকর, হৃষীকর, ঋষিদেব, শ্রীতেজা, সাত্যকেতু, বজ্রসংহত, সর্বাবিভু, হেমবর্ন, অত্যুচ্চগামী, প্রবাতসার, পুস্পকেতু, বররূপ, সুলোচন, ঋষিগুপ্ত, জিনবত্ত, উন্নত, পুষিপত, ঊরনীতেজা, পুষ্কর, ইরশ্মি, মাঙ্গল, সুদর্শন, সিংহতেজা, স্থিবুদ্ধিদত্ত, বসন্তগন্ধি, বিপুলকীর্তি, পুষ্য, তিষ্য, লোসুন্দর, বিস্তরনভেদ, রত্নকীর্তি, উগ্রত্তেজা, ব্রম্মতেজা, সঘোষ, সুপুশ্য, সুমনোজ্ঞ, সুতেস্ট, প্রহতিনেত্র, গুনরাশি, মেঘস্বর, সুররন, আযুস্তেজা, সুনীলগাজগামী, জিতশত্রু, লকাভিলাশি, শিখি, বিশ্বস্তু, কেনকমুনি, কাশ্যপ, বিপশ্চিৎ, সম্পুজিত, ক্রুকচ্ছেদ ইত্যাদি।
যাই হোক, সংসারের প্রতি গৌতম এর অনাগ্রহ দেখে ১৮ বছর বয়সে তাকে যশোধারা নামে এক সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু তবুও সংসার জীবনে সিদ্ধার্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন না। মানুষের জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু তাকে সর্বক্ষণ ভাবিত করে রাখত। পরিশেষে তার স্ত্রী যশোধারার গর্ভে রাহুল নামে এক পুত্রসন্তান জন্ম হওয়ায় সিদ্ধার্থ ভয় পেয়ে গেলেন-সংসারের মায়ায় বুঝি তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়বেন। তাই সেই বন্ধন ছিন্ন করে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করলেন।

প্রথমে তিনি উপস্থিত হলেন বিহারে। সেখান থেকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমন করেন। অনেক সাধু ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। বড় বড় সাধুদের অনন্য সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন দুজন নামী সাধকের নিকট, তারা হলেন আড়ার কলাম ও রুদ্রক। তারপর তিনি চলে যান গয়াতে । সেখানে এক বোধিবৃক্ষের তলায় বসে শুরু হলো তার দীর্ঘ তপস্যা। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করে তিনি সেই বৃক্ষ ত্যাগ করবেন না। অনেক শারীরিক বাধা-বিপত্তি ও বিড়ম্বনা সত্বেও তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। তখন তার নাম হলো বুদ্ধ। সিদ্ধিলাভ এর এই দিনটি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। বুদ্ধদেবের বয়স তখন ৩৫ বছর।
সিদ্ধিলাভের পর গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচারে প্রথমে উপস্থিত হন ঋষিপত্তমে। এই ঋষিপত্তম বর্তমানে সারনাথ নামে পরিচিত। এখানে তিনি তার পূর্বপরিচিত পাঁচ জন সংসার ত্যাগীকে দীক্ষা দেন। সেই পাঁচজন সন্ন্যাসীর নাম কৌড্রিন্য, অশ্বজিত, বপ্র, ভদ্দিয়া ও মহানাম। এই ঘটনা বৌদ্ধ সমাজে ধর্মচক্র নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব তাদের চারটি মহাসত্যের কথা বলেছিলেন। সেগুলি এই প্রকারঃ

প্রথম সত্য-মানুষের সাংসারিক জীবনে দুঃখ হলো মজ্জাগত। একটি দুঃখের পর আরেকটি আসে, তারপর আরেকটি অর্থাৎ ওই বিড়ম্বনা সকল সময়ে সাম্প্রতিক।

দ্বিতীয় সত্য-মানুষের দুঃখ ও বিড়ম্বনার মূল কারণ হলো বিষয় সম্পত্তির উপর লোভ, মানুষের অন্তরে প্রলোভনের এই বিষদাঁত ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তৃতীয় সত্য-ওই বিষদাঁতকে সমূলে উৎপাটন করার দায়িত্ব মানুষের নিজেরই।

চতুর্থ সত্য-মানুষের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত নির্বাণ লাভ নির্বাণ লাভ। নির্বাণ লাভ কিভাবে সম্ভব, বুদ্ধদেব তার জন্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই আটটি উপায় অবলম্বন করলে একজন মানুষের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব।

থেরবাদ ত্রিপিটক এবং মহাযানের আগমগুলিতে বলা হয়েছে যে, সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সময় অষ্টাঙ্গিক মার্গকে পুনরাবিষ্কার করেন। এই সূত্রগুলিতে উল্লিখিত আছে যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্বেকার বুদ্ধরা অষ্টাঙ্গিক মার্গের চর্চা করেছেন এবং গৌতম বুদ্ধ এই শিক্ষা তার শিষ্যদের দিয়ে গেছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো:

সম্যক প্রজ্ঞা যা দুই প্রকার–সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সঙ্কল্প।

কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মের সঠিক জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলে। অহিংসা, চুরি না করা, অব্যভিচার ও সত্যভাষণ হল কায়িক সুকর্ম; নিন্দা না করা, মধুর ভাষণ ও লোভহীনতা হল বাচনিক সুকর্ম এবং মিথ্যা ধারণা না করা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ না হওয়া হল মানসিক সুকর্ম।
সম্যক দৃষ্টির উদ্দেশ্য হল ভুল, ভ্রান্তি এবং মতিবিভ্রম দূর করা। বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক অর্জনের উপায় হল সম্যক দৃষ্টি।

সম্যক শীল:
সম্যক শীল তিন প্রকার–সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা। মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, কটুবাক্য ও অতিকথন ত্যাগ করে সত্যভাষণ ও মধুর বচনকে সম্যক বাক্য বলে। অহিংসা, চুরি না করা, অব্যভিচারকে সম্যক কর্ম এবং অসৎ পন্থা ত্যাগকে সম্যক জীবিকা বলে। গৌতম বুদ্ধ অস্ত্র ব্যবসা, প্রাণী ব্যবসা, মাংস বিক্রয় এবং মদ ও বিষের বাণিজ্যকে মিথ্যা জীবিকা বলে উল্লেখ করেছেন।

সম্যক সমাধি:
সম্যক সমাধি তিন প্রকার–সম্যক প্রযত্ন, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

সম্যক প্রযত্নে হলো ব্যায়াম, ইন্দ্রিয় সংযম, কুচিন্তা ত্যাগ এবং সৎ চিন্তার চেষ্টা ও তাকে স্থায়ী করার চেষ্টাকে সম্যক প্রযত্ন বলে।

কায়া, বেদনা, চিত্ত ও মনের ধর্মের সঠিক স্থিতিসমূহ ও তাদের ক্ষণবিধ্বংসী চরিত্রকে সদা স্মরণে রাখাকে সম্যক স্মৃতি এবং চিত্তের একাগ্রতাকে সম্যক সমাধি বলে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ পুরোটাই আমাদের পতঞ্জলি যোগদর্শনের অংশবিশেষ।

বুদ্ধদেব তার জীবনে ব্যাপক পরিভ্রমন করেছেন এবং ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি কোথাও এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে না। কেবলমাত্র বর্ষা ঋতুতে কোন একটি স্থানে একটানা চার মাস অবস্থান করত। বহু বিপন্ন বাক্তিকে তিনি মুক্তির পথ দেখান, বহু চঞ্চল মন কে তিনি প্রশান্ত করেন।

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে গমন করলে তার পুত্র রাহুল, পত্নী, ভৃত্য ও নাপিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ৮০ বছর বয়সে তিনি পায়ে হেটে যাচ্ছিলেন বৈশালী থেকে কুশিনগর। পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দতে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ করেছিলেন।

মল্লগন বুদ্ধাদেবের দেহ দাহ করেছিলেন। বৌদ্ধারা তার দেহাবশেষ সংগ্রহ করে দশ জায়গায় দশ টি স্তুপ নির্মাণ করেন এবং স্তুপগুলির অভ্যন্তরে সেই দেহাবশেষ সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন।
বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলেননি। তিনি মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ছিলেন। ফলে হিন্দু ব্রাহ্মন্যবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ ছিল অনিবার্য। বুদ্ধদেব বলতেন, যার জন্ম হয়েছে ক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে তার বিনাশ অনস্বীকার্য। এই সময় মধ্যে যিনি সত্য ধর্ম পালন করতে পারেন, তবে তাকে আর এই বিষাদ পূর্ণ পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে না।

সপ্তপদে প্রস্ফুটিত সপ্ত পদ্মফুলের ইতিহাস

****

ভগবান বুদ্ধের জন্মের পর পরই তিনি জলের উপরে হেঁটে যান যেখানে সপ্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। তিনি যে যে পদ্ম ফুলে পদচারণা করেছিলেন সত্যিই কি এইগুলো পদ্মফুল ছিল নাকি অন্যে কিছু এবং কেন তিনি–আমি শ্রেষ্ঠ, আমি জৈষ্ঠ বলেছিলেন?

১ম পদ্মফুলের (বসুমতী) ইতিহাস

এই পৃথিবীতে বহু যুগের পর, কল্প–কল্পান্তরের পর ভগবান তথাগত বুদ্ধগণের আর্বিভাব ঘটে। বুদ্ধ গণের জন্মের কারনে এই জগত সংসার পূণ্যের স্রোতে প্লাবিত হয়। যে দিকে উনার ধর্মসুধা প্রবাহিত হবে সেই দিকে ধর্মের বন্যা বয়ে যাবে। তাই এমন মহাপুরুষের জন্মের সময় এই পৃথিবী দেবী বসুমতী চিন্তা করিতে লাগলেন–বহু জন্মের পরে ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করছেন। আমি আজ ধন্য এমন এক মহামানব আমার এই ভূমিতে পদচারণা করবেন। তাই এই দূর্লভ মুহুর্তকে আমি চিরস্মরণীয় করে রাখবো। আমি স্বয়ং তথাগত বুদ্ধকে অভিনন্দন জানাবো। ওনার চরণে নিজের জীবকে সর্মপন করব। ওনার পা যেন প্রথম মাটিতে না পরে আমার উপর পরে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এই ভেবে দেবী বসুমতী পদ্মফুলের রূপ নিয়ে তথাগত বুদ্ধে সামনে নিজেকে আত্নসর্মপন করলেন।

২য় পদ্মফুলের (দেবরাজ ইন্দ্র) ইতিহাস

তখন স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র তা দেখে চিন্তা করিতে লাগলেন–মহামানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করছেন। দেবী বসুমতী পদ্মফুলের রূপ নিয়ে ওনার পদচরণে গেলেন। আমি স্বর্গের অধিপতি হয়ে আমি কেন যাব না এমন মহাপুরুষের আর্বিভাব কালে? আমিও যাব তথাগত বুদ্ধের পদচারণে। নিজের জীবনকে ওনার রাতুলচরণে সর্মপন করব। এই ভেবে তিনিও পদ্মফুলের রূপ নিয়ে মহাপুরুষের পদচারণে নিজেকে সর্মপন করলেন।

৩য় পদ্মফুলের (চারিলোকপাল) ইতিহাস

****

স্বর্গে অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যখন পদ্ম ফুল রূপে তথাগত বুদ্ধের চরণে গেলেন তা দেখে এই পৃথিবী রক্ষাকারী চারিলোকপাল দেবরাজগণ চিন্তা করতে লাগিলেন–স্বয়ং দেবগণের মহারাজা পদ্মরূপে মহাপুরুষের পদচরণে গেলেন আমরা কেন যাবো না। আমরাও মহামানবের চরণে নিজেকে সর্মপন করব। এইভেবে চারিলোকপাল দেবরাজ পদ্মরূপে তথাগত বুদ্ধের পদচরণে নিজেদেরকে সর্মপন করলেন।

একে একে যখন দেবী বসুমতী, দেবরাজ ইন্দ্র, চারিলোকপাল দেবরাজগণ মহাপুরুষের পদতরে পদ্মরূপে গমন করলেন তখন ব্রহ্মলোকের অধিপতি মহাব্রহ্মরাজা (৪) চিন্তা করিতে লাগলেন–স্বর্গের অধিপতিসহ মর্ত্যলোকে অধিপতিগণ পদ্মরূপে বুদ্ধের রাতুলচরণে গেলেন তাহলে আমি কেন যাব না। আমিও পদ্মরূপে মহামানবের চরণতরে নিজেকে সর্মপন করব। তাই তিনিও মহাপুরুষের চরণতরে পদ্মফুলের রূপ নিয়ে নিজেকে সর্মপন করলেন।

ঠিক এইভাবে একে একে সাতটি পদ্মফুলের রুপ নিয়ে সাতজন মহাগুণীজন বোধিসত্ত্বের রাতুল পদচরণে গমন করেছিলেন।

আমি শ্রেষ্ঠ, আমি জৈষ্ঠ বলার কারন:–একে একে ব্রহ্মলোকের মহাব্রহ্মরাজা, স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র, চারিলোকপাল দেবরাজগণ ও মাতা বসুমতী দেবী যখন পদ্মরূপে মহামানবের রাতুল চরণে গেলেন তা দেখে ব্রহ্মলোকে সকল ব্রহ্মাগণ (৫) চিন্তা করিতে লাগিলেন–আমাদের রাজা স্বয়ং পদ্মরূপে ভাবীবুদ্ধকে পূজা করতে গেলেন আমরা কেন যাব না। আমরাও যাব বোধিসত্ত্বকে পূজা করার জন্য। এই ভেবে সকল ব্রহ্মাগণ লুম্বিনী কাননে উপস্থিত হলেন বোধিসত্ত্বকে দেখার জন্য। তা দেখে স্বর্গে দেবতাগণ (৬) সবাই চিন্তা করতে লাগলেন–ব্রহ্মলোকে সকল পূজনীয়গণ ও আমাদের স্বর্গের মহারাজা দেবরাজইন্দ্র, চারিলোকপাল দেবরাজগণ পদ্মরূপে ওনার চরণে গেলেন এবং সবাই মহামানবকে দেখার জন্য লুম্বিনী কাননে উপস্থিত হয়েছেন আমরাও যাব ভাবীবুদ্ধকে দেখার জন্য। এইভেবে সমস্ত দেবতাগণ লুম্বীনি কাননে বোধিসত্ত্বকে পূজা করার জন্য সমাগত হলেন। শুধু এইচক্রবালের সত্ত্বগণ নয় দশহাজার চক্রবালের সমস্তসত্বগণ লুম্বীনি কাননে উপস্থিত হলেন ভগবান বুদ্ধকে পূঁজা করার জন্য।

তা দেখে অসুর অধীপতি সহ সমস্ত যক্ষ ও নাগলোকের নাগরাজ সহ সমস্ত নাগগণ (৭) লুম্বীনি কাননে উপস্থিত হলেন ভাবী বুদ্ধকে পূজা করার জন্য।

তখন বোধিসত্ত্ব সিদ্বার্থ জন্মের পর পায়ে হেঁটে একে একে ৬টি পদ্মফুল পেরিয়ে সর্বশেষ পদ্মরূপী মহাব্রহ্মরাজার উপর দাড়িয়ে জগৎ অবলোকন করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি পূর্বদিকে তাকালেন। তখন পূর্বদিকের সমস্ত দেব–ব্রহ্মগণ, নাগ–যক্ষগণ বলতে লাগলেন–প্রভু এইদিকে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও জৈষ্ঠ আর কেউ নেই, আপনিই সকলের শ্রেষ্ঠ ও জৈষ্ঠ। তখন তিনি একে একে দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকে তাকালেন সেই দিকের উপস্থিত সকল দেব-ব্রহ্মাগণ ও নাগ- যক্ষগণ একই কথা বললেন–প্রভু আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও জৈষ্ঠ। আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও জৈষ্ঠ আর কেউ নেই। তারপর মহামানব বুদ্ধ বলেলেন–"এই জগতে আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই জৈষ্ঠ, এই আমার অন্তিম জন্ম। আমি আর এই জগৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করব না।"

তখন ভগবান বুদ্ধের এই বাণী দশহাজার চক্রবালকে প্রকম্পিত করেছিল। দশহাজার চক্রবালের সমস্ত সত্ত্বগণ সাধুবাদ দিতে লাগলো। দশহাজার চক্রবালের সমস্ত সত্ত্বগণ পুষ্প দ্বারা ভগবান বুদ্ধকে পূজা করতে লাগলো। তখন পৃথিবীতে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগলো। আর সেই পুষ্প বৃষ্টিতে ভাবী বুদ্ধ সহ জগতের সকল সত্ত্বগণ প্লাবিত হয়েছিল।

সংগৃহীত:–প্রজ্ঞামিত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

সুজাতা কেন বুদ্ধদেবকে পায়েস খাইয়েছিলেন বুদ্ধদেব তখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হননি; তিনি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করতে চাইছেন। তখন তিনি সত্যজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কঠোর তপস্যায়, অনিদ্রায়, অনাহারে তাঁর শরীর শীর্ণ শুষ্ক হয়ে গেছে। এই সময় একদিন তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। স্নান সেরে ফিরে আসার সময় তিনি শারীরিক দুর্বলতার জন্য মুছিত হয়ে পড়লেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন। এক দেবপুরুষ সেতার বাজাচ্ছেন। তাঁর সেতারের তিনটি তার, প্রথম তারটি খুব শক্ত আর খুব টান করে বাঁধা। তৃতীয় তারটি খুব আলতো করে কোনো মতে দুপ্রান্ত বাঁধা আছে, এতে কোনো রকম টান নেই, ঝুলে পড়ে আছে। আর মাঝের তারটি না খুব টান করে বাঁধা, না খুব আলতো করে সুন্দরভাবে সুর দিয়ে বাঁধা। যে দেবপুরুষ সেই সেতার বাজাচ্ছেন। তিনি শুধু মাঝের তারটিতেই মধুর সুর তুলছেন।

বুদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন–বুঝেছি এটাই জীবনের সত্য। আমাদের জীবন সেতারের তারের মতো। কঠোর তপস্যা করেও নয়, চরম ভোগ বিলাসে জবন এলিয়ে দিয়েও নয়, মাঝের পথ বা মধ্যপথ (মঝঝিম পন্থা) হল আসল পথ, সত্য লাভের উপায়। তখনি তিনি স্থির করলেন আর চরম কৃচ্ছ ধন নয়, পরিমিত আহার করে তপস্যা করতে হবে। কঙ্কালসার দেহ নিয়ে কিছু কাজ হবে না।

এসব ভাবতে ভাবতে এক বট গাছের তলায় এসে বসে আছেন, সেই সময় সুজাতা এসেছেন বন দেবতার পূজা দেওয়ার জন্য। পুজোর জন্য তিনি যে পায়েস এনেছিলেন তা তিনি সন্ন্যাসীকে নিবেদন করলেন। সন্ন্যাসী গৌতম সুজাতার দেওয়া সেই পায়েস গ্রহণ করলেন। পায়েস খেয়ে তিনি শরীরে বল পেলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে উঠে গিয়ে এক অশ্বথ গাছের তলায় তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করলেন–তিনি বোধি লাভ করে বুদ্ধ হলেন।

এখন প্রশ্ন হল, সুজাতা কে ছিলেন? কেনই বা তিনি বুদ্ধদেবকে পায়েস খাইয়েছিলেন? ঘটনা হল–নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বন আর বনের এক প্রান্তে সেনানী নামে একটি গ্রাম। সেই গ্রামে নন্দিক নামে এক ধনী বণিক ছিলেন, সুজাতা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তাদের কোনো সন্তান ছিল না, তাই তারা ওই বনের বট গাছের তলায় বন-দেবতার কাছে মানত করেছিলেন যে, এঁদের সন্তান হলে তারা দেবতার পুজো দেবেন। তাদের সন্তান হয়েছিল, তাই সুজাতা সেই আনন্দে পূর্ণা নামে এক দাসীকে সঙ্গে নিয়ে দেবতার পুজো দিতে গিয়েছিলেন। আর পুজোর জন্য অন্য উপাচারের সঙ্গে পায়েস নিয়ে গিয়েছিলেন।

দেবতার স্থানে গিয়ে সুজাতা দেখলেন যে বট গাছের তলায় দেবতার পুজো হয়, সেই গাছের তলায় এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। সুজাতার মলে হল ইনি হয়তো সেই দেবতা, সন্ন্যাসীর রূপ ধরে বসে আছেন। সুজাতা পুজোর সেই পায়েস ভক্তি সহকারে সন্ন্যাসীকে নিবেদন করলেন। সন্ন্যাসী সেহ পায়েস গ্রহণ করলেন। আসলে এই পায়েস গ্রহণ তার সাধন পথের পরিবর্তনের সূচক, কঠোর কৃচ্ছ সাধনের পরিবর্তে মধ্যপথ গ্রহণের ইঙ্গিত। এই পায়েস মুছে দিল তার দীর্ঘ ছয় বছরের নিস্ফল কঠোর তপস্যা।

পায়েস খেয়ে তিনি শরীরে বল পেলেন। সেখান থেকে উঠে তিনি নৈরঞ্জনা নদীর তীর ধরে এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে সন্ধ্যা নেমে এল। বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ্র আলোকে তিনি এক অশ্বত্থ গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। এখানেই তিনি রাতের তৃতীয় প্রহরে বুদ্ধত্ব লাভ করে ঋষি গৌতম থেকে হলেন প্রভু বুদ্ধদেব।

বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য, পরিচারক ও সচিব আনন্দ

সমস্ত প্রধান শিষ্যদের মধ্যে, আনন্দের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুদ্ধের নিকটতম সম্পর্কে। বিশেষত বুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, আনন্দ ছিলেন তাঁর পরিচারক এবং নিকটতম সঙ্গী। বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধের স্মরণে প্রথম বৌদ্ধ কাউন্সিলের স্মৃতিচিহ্ন শোনাবার শিষ্য হিসাবে আনন্দকেও স্মরণ করা হয়।

আমরা আনন্দ সম্পর্কে কি জানতে পারি? এটি ব্যাপকভাবে সম্মত হয় যে বুদ্ধ ও আনন্দ পরস্পর খুড়তুতো ভাই ছিলেন।

আনন্দের বাবা রাজা শুদ্ধোধনকে একটি ভাই ছিলেন অমিতোদানন্দ ও তাঁর স্ত্রী মৃগী যাঁদের সন্তান আনন্দ । মনে করা হয় যে বুদ্ধ যখন জ্ঞান অর্জনের পর প্রথমবার কপিলাবস্তুতে ফিরে আসেন তখন খুড়তুতো ভাই আনন্দর সঙ্গে কথা বলেন এবং পরে আনন্দ তাঁর শিষ্যত্ব নেন।
যে ছাড়াও, বিভিন্ন দ্বন্দ্বমূলক গল্প আছে। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, ভবিষ্যতে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য আনন্দ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং একই বয়স ছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকের কথা হলো আনন্দ এখনও একটি শিশু, সম্ভবত সাত বছর বয়সী, যখন তিনি সংঘে প্রবেশ করেন, যা তাকে বুদ্ধের চেয়ে কমপক্ষে ত্রিশ বৎসর কম করে দিতেন। আনন্দ বুদ্ধ ও অন্যান্য প্রধান শিষ্যদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন, যা এই গল্পটির পরবর্তী সংস্করণটি আরো সম্ভাব্য বলে মনে করে।

আনন্দের পরিচিতি ছিল একটি বিনয়ী, শান্ত ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণ বুদ্ধকে অনুগত এবং বুদ্ধদেবের প্রতি সম্পূর্ণ শরণাগত ছিলেন। তাঁর একটি অদ্ভুত স্মৃতি আছে বলা হয়; বুদ্ধের কথাবার্তা কেবলমাত্র একবার করে শুনে পরে সেটি তিনি স্মৃতি থেকে উচ্চারণ করতে পারতেন অর্থাৎ এখনকার পরিভাষায় ফোটোগ্রাফিক মেমোরি ছিল তাঁর।

এক বিখ্যাত কাহিনী অনুসারে, বুদ্ধদেবকে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করেন আনন্দ। তবে, বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই তিনি অন্যান্য শিষ্যদের কাছ থেকে উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন।

বুদ্ধের পরিচারক

যখন বুদ্ধদেব ৫৫ বছর বয়সী ছিলেন তখন তিনি সংহতিকে একটি নতুন পরিচারক প্রয়োজন বলে জানান।

পরিচারকের কার্য ছিল সে হবে দাস, সচিব, এবং বিশ্বাসী তিনটির সমন্বয়। তিনি বুদ্ধদেবকে শিক্ষার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য “পোষাকগুলি” যেমন ধৌতকরণ ও পরিচ্ছদ পরিধানের যত্ন নিতেন। তিনি বার্তা প্রেরণ করেন এবং কখনও কখনও দ্বারক হিসাবে কাজ করেন, যাতে বুদ্ধদেবকে একাধিক দর্শক একযোগে আক্রমণ করতে না পারে।

অনেক সন্ন্যাসী আপনার বক্তৃতা এবং চাকরি জন্য নিজেদের মনোনীত করতে চেষ্টা করলেও আনন্দ শান্ত ছিলেন। যখন বুদ্ধদেব তার খুড়তুতো ভাইকে কার্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন, তখন আনন্দ কেবল শর্তগুলির সাথে মেনে নিলেও তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, বুদ্ধ তাঁকে খাদ্য বা পোশাক বা বিশেষ কোন আবাস প্রদান করতে পারবেন না, যাতে অবস্থানটি বস্তুগত লাভের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর সন্দেহের কথা বলার সুযোগও চাওয়া হয়েছিল। এবং তিনি অনুমতি চান যে বুদ্ধদেব তাঁর কাছে যে কোন ধর্মোপদেশ পুনরাবৃত্তি করবেন যাতে তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। বুদ্ধদেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি আনন্দের কথায় সম্মত হন, এবং আনন্দ বুদ্ধের জীবনের বাকি ২৫ বছরের জন্য পরিচারক হিসেবে কাজ করেন। বুদ্ধদেবের প্রবচন কালীন অনেক প্রবচনের পরিসমাপ্তি বুদ্ধদেব আনন্দকে দিয়ে করাতেন তাঁরই উপস্থিতিতে এবং আনন্দের পরিসমাপ্তি সর্বদা গ্রহণযোগ্য ছিল তাঁর কাছে, এতটাই ভরসা তিনি করতেন আনন্দকে। সাধনে আনন্দ অতি উচ্চস্তরে অবস্থান করেও সেটা কখনো প্রকাশ করেননি। আনন্দ এবং প্রজাপতির নিয়ম প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের সমন্বয়ের গল্প পালি ক্যাননের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশগুলির একটি। এই কাহিনীটি আনন্দের বৌদ্ধকে তার সৎমা এবং মাতৃষ্মসা, মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বলে মনে করে।

বুদ্ধদেব শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়েছিলেন যে, নারীরাও তাদের মুক্তির জন্য এই সংঘে পুরুষদের মত নিযুক্ত হতে পারবে। কিন্তু তিনি পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে, নারীদের অন্তর্ভুক্তি হবে বৌদ্ধ সংঘের অন্যতম পতনের কারণের একটি। আনন্দ মনোনীত হওয়া নারীর অধিকারের পক্ষে সমর্থন করেন।

বুদ্ধের পরিনির্বাণ পালি সুপ্ত-পিঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির একটি হলো মহা-পরিবর্ধন সুতার, যা বুদ্ধের শেষ দিন, মৃত্যুর এবং পরিনির্বাণকে বর্ণনা করে। এই সূত্রে আবার এবং আবার আমরা বুদ্ধদেবকে আনন্দের পরিচয় করিয়ে দেখি, তাঁকে পরীক্ষা করে, তাঁকে তাঁর চূড়ান্ত শিক্ষা ও সান্ত্বনা প্রদান করে।

এবং বৌদ্ধরা নির্বাণে তার সাক্ষাৎকারের সাক্ষী স্বরূপ তাঁর চারপাশে জড়ো হয়, বৌদ্ধ আনন্দের প্রশংসা করেছেন–"ভিক্ষুগণ [সন্ন্যাসী], আনন্দ সর্বদা আশীর্বাদস্বরূপ, অতীতেও বারংবার প্রজ্ঞাময় আধ্যাত্মিক জনগোষ্ঠী চমৎকার এবং অনুগত আন্তরিক ভিক্ষুক [সন্ন্যাসী] ছিলেন। যেমন আমার আনন্দ আছে।"

আনন্দ এর বুদ্ধত্ব লাভ এবং প্রথম বৌদ্ধ কাউন্সিল বা সাঙ্গিতিকি বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের পর ৫০০ জন আলোকপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী একসঙ্গে তাদের গুরুর শিক্ষাগুলি কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন। বুদ্ধের কোন উপদেশই লেখা হয়নি। উপদেশের স্মৃতি স্মরণ করাই ছিল সম্মানিত পন্থা, কিন্তু যিনি এখনো জ্ঞান অর্জন করতে পারেন নি বা শ্রবণ করেন নি, তিনি কী করে সেগুলো মনন ও স্মরণ করবেন?

বুদ্ধের মৃত্যু পরে আনন্দ অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এবং তিনি এখন ধ্যান করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। কাউন্সিলের আগে সন্ধ্যায় শুরু হয়, আনন্দ ধ্যানে বসেন জ্ঞান অর্জন করতে এবং বোধি অর্জন করেন। তিনি মহা সাঙ্গীতিকি বা মহা সম্মেলন বা কাউন্সিলে যোগ দেন এবং বুদ্ধের বক্তব্য পাঠ করার আহ্বান জানান। কিন্তু সঙ্গীতিতে গৌতম বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য আনন্দের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। একজন অর্হত না হওয়ায় আনন্দের অংশগ্রহণের ব্যাপারে মহাকশ্যপের আপত্তি ছিল। তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ আনা হয় বলে বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে সংঘে নারীদের প্রবেশের ব্যাপারে আনন্দের সক্রিয়তা, গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুশয্যায় তাকে জলপান না করানো, গৌতম বুদ্ধের মৃতদেহে প্রথমে নারীদের স্পর্শ করানো ইত্যাদি অভিযোগের যথাযথ উত্তর দেওয়ায় সন্তুষ্ট ভিক্ষুগণ আনন্দকে সংগীতিতে যোগদানে অনুমতি প্রদান করেন। সুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায়ের বিভিন্ন বিষয়কে প্রশ্নের আকারে উপস্থিত করা হয়, যার যথাযথ উত্তর আনন্দ দিতে সক্ষম হন, ফলে সুত্তপিটকের অবয়ব তৈরী করা সম্ভব হয়।

পরের কয়েক মাস তিনি পড়তেন এবং সমাবেশে স্মৃতিচারণে বক্তৃতা করতেন এবং মৌখিক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষাগুলি সংরক্ষণের জন্য সম্মত হন। আনন্দকে "ধর্মাচরণের রাখালের দোকান" বলা হয়।

বলা হয় আনন্দ একশো বছর বয়স মতান্তরে আশি বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আনন্দর এক শিষ্য তাঁর কাছ থেকে শেখা বুদ্ধদেবের কোনো বাণী যথাযথ না বলতে পারায় তিনি বলেন যে আনন্দর বয়স হয়ে গেছে, তিনি এখন আর আগের মত স্মরণ করতে পারেননা, এই কথা জেনে আনন্দ দেহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বুদ্ধদেবের স্মৃতির কিছু কিছু তিনি তাঁর শিষ্য সনবসি ও মাঝঝান্তিকার মধ্যে দান করেন, তারপর তিনি বৈশালীতে যান। তিনি রাজা অজাতশত্রুকে কোনো একসময় কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর নির্বাণের সময় তিনি তাকে জানাবেন। সেই মত আনন্দ যখন রোহিনী (মতান্তরে গঙ্গা) নদীর মাঝামাঝি পৌঁছন তখন দেখেন যে রোহিনী নদীর একদিকের তীরে অজাতশত্রু দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দেহত্যাগের সাক্ষী হতে আর আরেকদিকে দাঁড়িয়ে আছেন লিচ্ছবি ও কোলীয়রা যাদের তিনি বংশে জন্মেছিলেন, তিনি বুঝতে পারেন যে যেকোনো তীরেই তিনি দেহত্যাগ করুন না কেন, তাঁর দেহের পারলৌকিক ক্রিয়া নিয়ে বিবাদ অবশ্যম্ভাবি, তাই তিনি

যোগবলে রোহিনী নদীর মাঝখানে ধ্যানযোগে ব্রহ্মলীন হন এবং তাঁর দেহ বাতাসেই অগ্নিসংযোগ হয়ে দুটো অংশে ভাগ হয়ে যায়, একটি ভাগের ওপরে রাজা অজাতশত্রু স্তুপ নির্মাণ করেন, আরেকটি অংশের ওপরে লিচ্ছবিরাও স্তুপ নির্মাণ করেন, পরে সম্রাট অশোক এই স্তুপগুলোতে তাঁর প্রভূত সম্পদ দান করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে, একটি চীনা তীর্থযাত্রী আনন্দ এর অবশেষ ধারণকারী স্তূপ খুঁজে পান, এক বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর চেষ্টায়। তার জীবন, ভক্তি এবং সেবা পথ একটি আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়।

ইসিদাসী ও বোধি

****

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে যাত্রা করেছে। আকাশে লেগেছে দিনশেষের রংয়ের ছোঁয়া। সেই নরম ম্লান আলো বড়ো অপরূপ করে তুলেছে চারিদিক। নদীর বুকে জলের উপরেও পড়েছে সেই রাঙা আলোর রাশি। নদীটির নাম নৈরঞ্জনা। আসন্ন সন্ধ্যার মুখে নদীর তীরে বালির চরে পা ছড়িয়ে বসেছিল দুই ভিক্ষুণী। তাদের একজনের নাম ইসিদাসী ও অন্যজনের নাম বোধি। বোধির বয়স এখনও কুড়ি বছর হয়নি, তার মুখটিতে কৈশোরের লাবণ্যমাখা। এখনও প্রব্রজ্যা পায়নি সে, উপসম্পদা নিয়ে কোশলরাজ্যের পূর্বারাম ভিক্ষুণী সংঘে থাকে।

ইসিদাসীর বয়স প্রায় তিরিশ পেরিয়েছে। সে সংঘে যোগ দিয়েছে সংসার থেকে প্রত্যখ্যাত হয়ে। তার জীবনে অনেক বেদনাবহ ইতিহাস আছে, সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির। কথা খুবই কম বলে, বলা চলে কথাই বলে না প্রায়, এবং যখনই দু একটা সামান্য কথা বলে, সেই সময় তার শরীর সজাগ ও কঠিন হয়েওঠে ।

বোধি ইসিদাসীর সঙ্গে মগধ রাজ্যের রাজগৃহ নগরে চলেছে। সুদূর কৌশম্বী নগর থেকে নানা পথ ঘুরে অবশেষে তারা এসেছে রাজগৃহে। আজকের রাতটা বেণুবনের ভিক্ষুণী বিহারে থাকার ইচ্ছে তাদের। তবে এখন বৌদ্ধ সংঘগুলিতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায়, আগত সকলকে অনেক সময় বিহারে জায়গা দেয়া সম্ভব হয় না। তখন আগত ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের রাতে কোনো পর্বত কন্দরে অথবা কোনো উদ্যানে বা বনের গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। গৃহস্থদের আবাসে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের থাকার নিয়ম সংঘে প্রতিষ্ঠিত নয়।

দীর্ঘপথ কেবলমাত্র পায়ে হেঁটে এসেছে তারা। রাজগৃহে প্রবেশ করার আগেই সূর্যের অসহ্য তাপে ভিক্ষুণী বোধি অসুস্থ হয়ে একটি গাছতলায় শুয়ে পড়েছিল, আর তার মাথাটিকেকোলের উপর নিয়ে তাকে জল খাইয়ে দিচ্ছিল, ইসিদাসী। সেই সময় সেখানে তরুণ শ্রেষ্ঠী সৌমাল্য তাদের দুজনকে দেখতে পেয়ে রথ থেকে নেমে আসেন। তারপর তিনি অনুরোধ করেন, তাঁর রথে অনুগ্রহ করে উঠে আসার জন্য। বোধির তখন ক্লান্তিতে প্রবলভাবে মাথা ঘুরছিল। সে ভেবেছিল, ইসিদাসী হয়তো শ্রেষ্ঠীর এই প্রস্তাবে রাজি হবে। কিন্তু ইসিদাসী শ্রেষ্ঠীকে নমস্কার জানিয়ে রথে উঠতে অস্বীকার করেছিল।

বোধির বিস্মিত মুখটি দেখে সে তাকে বলেছিল, “স্মরণ রেখো বুদ্ধের অনুশাসণ অনুযায়ী, কখনও শক্তি থাকতে ভিক্ষুণীদের কোনোরূপ যানে অবতরণ নিষিদ্ধ, এবং তা অমান্য করলে দুক্কট অপরাধ হবে। দুক্কট অর্থাৎ বুদ্ধের শাসন অনুসারে যা দুষ্কৃত, বুঝেছো?”

সচকিত হয়ে উঠেছিল বোধি। সে এখনও বিনয় ও পাতিমোক্ষ সম্পূর্ণ অধিগত করতে পারেনি। এছাড়াও আরও কত যে বিধি নিষেধ আছে সংঘে! সব এখনও সে জানেও না।

তারপর তারা অসহ্য দহনবেলা উপেক্ষা করে বহুদূর পথ অতিক্রম করেছে। পথে ভিক্ষায় সামান্য যা খাদ্য পেয়েছে, তাই গ্রহন করেছে। রাজগৃহের মহাপথের দুপাশে ভগবান বুদ্ধের পরামর্শে বহু ছায়াপ্রদায়ী ও ফলদায়ী বৃক্ষ রোপন করেছেন মহারাজ বিম্বিসার। একটি ফলন্ত বেল গাছের তলা থেকে দুটি পাকা বেল পেয়ে বোধি ভোরবেলায় তা কুড়িয়ে এনেছিল। তারপর মনে মনে বুদ্ধকে স্মরণ করে সে দুটি দিয়েই দুজনে দুপুরের জলপান করেছিল। অবশেষে দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তি দূর করতে নৈরঞ্জনার তীরে এসে বসেছে দুজন। গন্তব্য রাজগৃহ নগর এখনও খানিকটা দূরে। তবে সন্ধ্যার আগে হয়তো সেখানে তারা পৌঁছে যাবে।

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেল। বড় সুন্দর এই সময়। এক ঝাঁক সাদা বক সারিবদ্ধভাবে নিকটবর্তী নলবনের দিকে উড়ে গেল। নদীর ভেজা হাওয়ার ঝাঁপটায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে বোধির। দূরের কোনো প্রমোদবন থেকে সুগন্ধী পুষ্পের ঘ্রাণ ভেসে আসছে। বোধি তার চোখদুটি বুজে রেখেই বলল, 'আরও একটু সময় কি এখানে থাকা যাবে না ভিক্ষুণী ইসিদাসী? যদি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পরে বিহারে যাই, খুব কি অসুবিধা হবে?'

'বুঝেছি! তুমি নদীর এই শীতল বাতাসে স্নিগ্ধ হতে চাইছো, তাই তো? তবে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সেখানে আমাদের যেতে হবে। মহারাজ বিম্বিসারের শাসনে রাজগৃহের পথ ঘাট যদিও সুরক্ষিত, তবুও আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয় বোধি! তাছাড়া আরও একটি চিন্তার বিষয় হল, আজ বিহারে গিয়ে আমাদের আশ্রয়লাভ যদি না ঘটে? তখন কোথাও তো রাতটুকু কাটাতে আশ্রয় নিতেই হবে! রাজগৃহে অবশ্য গুহার অভাব নেই। সপ্তপর্ণী-গুহা কিংবা ইষিগলী পর্বতের গুহায়, কোথাও একটা আশ্রয় সম্ভবত পাওয়া যাবে। সেখানেও সূর্যের আলো থাকতে না যেতে পারলে, পাহাড়ে ওঠার সমস্যা হবে। হয়তো তির্থীক পরিব্রাজকেরা গুহাগুলো আগে থেকেই দখল করে রেখেছেন। কিছুই তো জানা নেই!'

'আমি এখানে এতক্ষণ চোখ বুজে শুধু বুদ্ধের ক্ষমাসুন্দর মুখটিই চিন্তা করছিলাম! আমার সর্বাঙ্গ যেন শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই বাতাসে। এই পুণ্যানদীর শীতল জলেই একদা বোধিজ্ঞান লাভ করার আগে ও পরে ভগবান স্নান করেছিলেন!'

'বুদ্ধের মুখ? সর্বনাশ! তুমি জানো, এতে শাক্যমুনি অসন্তুষ্ট হন! তিনি ব্যক্তিপূজার বিরোধী। আমাদের তিনি দেহাতীত চিন্তনে অভ্যস্ত হতে বলেছেন। তিনি বড় কঠোর। নিজে এত সুন্দর তিনি, তবুও তিনি সুন্দরকেই যেন ঘৃণা করেন। তিনি সুন্দর দেহের থেকে বেশি ভালবাসেন, মানুষের সুন্দর অন্তর। কারণ তিনি বলেন, সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে, কাল আর তা থাকবে না। এই প্রকৃতির প্রতিটি পদার্থই অনিত্য। অনিত্য বস্তুর সুন্দর অসুন্দর বিচার করতে নেই, কারণ তা একসময় লয় পেয়ে যায়। কিছুই স্থায়ী নয়! আমাদের তাঁর মতো করে আত্মচিন্তা ভুলে নিজের আমিত্বকে বর্জন করতে হবে।'

'আচ্ছা, আমি থেরী শোভার একটি ঘটনা শুনেছি, তা কি সত্যি?'

'নিশ্চয় সত্যি। শ্রাবস্তী নগরেই তো ঘটেছিল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা। একটি উদ্যানের ভেতর থেরী শোভার দুটি চোখের প্রশংসা করেছিল একজন কামুক ব্যক্তি। শোভা তা শুনে বিরক্ত হন, লোকটিকে অনেকবার বারণ

করেন তিনি। তাতেও শোনেনি সেই দুর্বৃত্ত! তখন শোভা নিজের দু চোখে এমন আঘাত করেন যে, তার দুচোখ বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তা দেখে কামুক সেই মানুষটি ভয় পেয়ে সেখান থেকে তক্ষুণি পালিয়ে যায়। শুনেছি বুদ্ধের কৃপায় শোভা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন আবার।'

'আপনি কি তাঁকে দেখেছেন? শোভা থেরীকে?'

'হ্যাঁ থেরী শোভা আমার পরিচিতা। তুমি সপ্তভগ্নীদের নাম জানো তো বোধি? গৌতম বুদ্ধের এই সুখ্যাত ধর্মে তাঁরা হলেন সকলের প্রাতঃস্মরণীয়া।'

'তাঁদের কথা শুনেছি। তাঁরা সাতজন হলেন চিরস্মরণীয়া। আমি বলছি তাঁদের নাম। প্রথম হলেন ক্ষেমা। তিনি বিম্বিসারের পাটরানি। তাঁর অধীনে প্রায় পাঁচশো ভিক্ষুণী প্রব্রজ্যা পেয়েছেন। এরপর আছেন উৎপলবর্ণা। তাঁর গায়ের রং উৎপল অর্থাৎ নীল পদ্মের মত স্নিগ্ধ ও অপরূপ সুন্দর, তাই নাকি এমন নাম। ইনি বিশেষ সাধন বিভূতিযুক্তা নারী। আছেন কুণ্ডলকেশা। তাঁর চুল কেটে দিলেও দু একদিনেই কুণ্ডলাকারে মাথা ভরে ওঠে, তাই তাঁর নাম কুণ্ডলকেশা। ইনি হলেন বিশেষ জ্ঞানী। এরপর কিসা গৌতমী। ইনি ভয়ানক কৃশ, এমন শীর্ণ দেহ বলে তাঁর নাম কিসা গৌতমী। ইনি প্রব্রজ্যালাভের কয়েকদিনের মধ্যে অর্হত্ব লাভ করেছেন। আছেন ধর্মদিন্না, ইনি ধর্ম বিষয়ে সুপণ্ডিত। সবশেষে উপাসিকা বিশাখা। ইনি যদিও গৃহী, তবুও স্মরণীয়া। সংঘের জন্য তাঁর বহু অবদান। পূর্বারাম ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। এছাড়া ভিক্ষুণীদের স্নানাগার, অসুস্থ ভিক্ষুদের জন্য চিকিৎসালয় ভিক্ষুদের অন্নদান আরও কত যে পুণ্যকর্ম তিনি করেছেন তার হিসেব নেই। তিনি হলেন ভিক্ষুণীসংঘের জননী স্বরূপ।'

'ঠিক বলেছো বোধি! একটা খবর শুনেছি, এই বিহারে সেই স্মরণীয়া থেরীদের অনেকেই নাকি উপস্থিত আছেন!'

'তবে এখনই এগিয়ে যাই চলুন! যদি তাঁদের দুর্লভ সঙ্গ একবার পেতে পারি! তাঁরা অনেকেই অর্হত্বলাভ করেছেন! তাঁদের দেখতে পাওয়াও পরম সৌভাগ্যের।'

'ঠিক কথা! তাঁদের কাছাকাছি থাকাও মহা পুণ্যের বোধি। চলো তাড়াতাড়ি বেণুবন ভিক্ষুণী সংঘে যাই! আজকের রাতটা হয়তো চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের জীবনে।'

অন্ধকার পথ কিছুটা বিপজ্জনক। নারীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেও তাদের মুক্তি মেলেনি দুর্বৃত্তদের লোভ থেকে। নারীদের সুরক্ষার কথা ভেবে বুদ্ধ তাই অসংখ্য অনুশাসন তৈরি করেছেন সংঘে। সন্ধ্যা হয়েছে। পথ এখনই প্রায় জনশূন্য। সশব্দে হ্রেষাধ্বনি করতে করতে কয়েকটি অশ্ববাহিত রথ চলে যাচ্ছে রাজপথ দিয়ে। রাজপথের দুধারে দীপাধারে সন্ধ্যা হতেই প্রজ্জ্বলিত দীপগুলি শোভা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি শোভিত উদ্যানের ভেতর থেকে বারবণিতাদের উচ্ছ্বল কলকণ্ঠে গান ও হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। উদ্যানগুলিতে বিলাসী নারী ও পুরুষদের ভিড়, সেখানকার প্রাচীর বরাবর অনেক মালাকারেরা তাদের বিপণী সাজিয়ে বসে আছে,সাজানো আছে সুগন্ধী নানাধরণের ফুলের মালা, পান, ও অনেক সুগন্ধি দ্রব্য–অগরু, চন্দন, কস্তুরী, লতা কস্তুরী ও কুমকুম। তারা উদ্যানের বাইরে বসে রসিক ক্রেতাদের অপেক্ষা করছে। লতা কস্তুরী একধরণের ভেষজ বীরুৎ

জাতীয় উদ্ভিদের ফুল। এর গন্ধ অনেকটা মৃগ কস্তুরীর মত, এবং এর দাম অনেকটাই কম। মৃগ কস্তুরীর অভাবে এই লতার ফুল দিয়ে কাজ চালানো হয়।

এই সেই রাজগৃহ নগর, যার একদিকে ভোগ বিলাস ও বিকৃত বাসনার রাশি, অপরদিকে বিহার ও সংঘগুলিতে সর্বত্যাগী ভিক্ষুরা নিজেদের অস্তিত্বটুকুও ভুলতে উদ্যোগী হয়েছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পরে রাস্তায় পথচারী বলতে ক্ষৌমবস্ত্র পরা কয়েকজন নারী ও পুরুষ। এদের সকলের গায়ে পোড়া মাটির গয়না। মেয়েদের মাথা কাপড়ে ঢাকা। তাদের শরীর ঢাকা, কেবল চোখ দুটি দেখা যাচ্ছে। ক্ষিপ্র পদে যাতায়াত করছে তারা নগরের দোকানগুলিতে। উপাসকদের সান্ধ্য পূজার ফুল সংগ্রহ করতে কোনো গৃহস্থের দাসী হয়ত এসেছে, কারুর দাসী হয়তো এসেছে প্রভু পরিবারের সাজশয্যার উপকরণ হিসাবে ফুলের মালা বা সুগন্ধী পান কিনতে।

গৃহস্থের দাসের দল রাস্তার দীপাধারগুলির নীচে বসে পাশা বা জুয়ো খেলছে। দাসীরা যাবার পথে তাদের কারুর দিকে ভ্রুভঙ্গী করে যাচ্ছে, কাউকে বা কটাক্ষ করছে, চোখে চোখে সংকেত আদান প্রদান চলছে।

ধনী পরিবারের মেয়েরা সূর্যাস্তের পরে পথে থাকে না। তাদের পোশাক সম্পূর্ণ আলাদা। তারা দু কুল পরিধান করে, তা একধরণের সূক্ষ্মবস্ত্র। তাদের উর্ধাঙ্গে বস্ত্রের উপর আরও একটি উর্ধবাস থাকে শোভনীয়তা বজায় রাখার জন্য। ধনীরা সকলেই সবসময় সোনা, মুক্তা ও নানা রত্নের অলঙ্কার ব্যবহার করেন। পূজা অর্চনায় ব্যবহার হয়, পট্টবস্ত্রের চেলী।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার পথে দস্যুর উপদ্রব হয়। মাঝে মাঝে প্রহরা স্বরূপ ঘোড়ায় চেপে দণ্ডধারী রাজার কর্মীকেরা যাতায়াত করেন পথে। তা সত্ত্বেও নারীদের নিরাপত্তার অভাব এখনও আছে মগধে। বিবাহিতা নারীদেরও কদর্য কামুকের লালসা থেকে মুক্তি নেই। তাদের সুযোগ পেলেই জোর করে অপহরণ করে প্রমোদ উদ্যানে প্রেরণ করা হয়।

মহারাজ বিম্বিসার বৌদ্ধধর্মের উপাসক। তাঁর প্রভাবে এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে একাধিক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘ। বুদ্ধ ভোগের অসারতা বোঝাতে জীবনপাত করছেন। তাঁর পদতলে একত্রিত হয়েছে অসংখ্য শিষ্য ও উপাসকেরা, তবুও জম্বুদ্বীপের বৃহত অংশের এখনও ধারণা, ভিক্ষুরা কর্মবিমুখ, তাই তারা ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে সুখে কাল কাটায়। তাদের ত্যাগ এবং প্রব্রজ্যা সম্পর্কে এখনও অনেক মানুষের মনেই সম্যক কোনও ধারণাই গড়ে ওঠেনি। বিম্বিসারের রাজত্বকালের মগধ এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের প্রতীক হয়ে বিরাজ করছে, যেখানে চরম ভোগ ও ত্যাগের নিদর্শন একত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে নগরের বুকে রাত্রি নেমে এল। অমাবস্যা তিথির মেঘমুক্ত আকাশের বুকে ফুটে উঠল অসংখ্য নক্ষত্রমালা। এক নারীর নিকষ কালো আঁচলে যেন হীরক কণার দ্যুতি জ্বলে উঠেছে। অবশেষে সংঘের সুবিশাল চাতালে এসে পৌঁছালোদুই ভিক্ষুণী বোধি আর ইসিদাসী। চাতালটি ঘিরে আছে ছোট ছোট পাথরের ঘর। কিছু মাটির ঘরও আছে। ঘরগুলি বেশিরভাগই এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। ভেতরে একটি বড় দালান আছে। বেশি জনসমাগম হলে বাইরের চাতালেও শয়ন আসন বিছিয়ে রাত্রিবাস করা হয়। চাতালে একটি পাথরের গোলাকৃতি সুন্দর চৈত্য আছে। চৈত্যটি ঘিরেই ঘরগুলি নির্মিত হয়েছে। চৈত্যটিতে রাখা আছে বুদ্ধের কেশধাতু।

ইসিদাসী ও বোধি বুদ্ধের সেই চৈত্যে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ঘরগুলিতে এখন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলছে। একজন বয়স্কা ভিক্ষুণী এসে তাদের বিশ্রামগৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে গোলাকৃতি একটি বিরাট মাটির প্রদীপ জ্বলছে। একটু সংকোচের সঙ্গে ইসিদাসী বলল, 'আজ রাতে আমরা এই সংঘে আশ্রয় চাইছি।'

'সংঘে ভিক্ষুণীদের সংখ্যা অতিক্রম করে গেছে, কিন্তু তোমরা দুজন আজ এখানে অবশ্যই থাকতে পারো। তবে রাত্রে হয়তো কোনো প্রকোষ্ঠে তোমাদের জায়গা হবে না, এই চাতালে বিশ্রাম করতে হবে, প্রকোষ্ঠগুলি এখন আর ফাঁকা নেই।'

'আমাদের তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্থবিরাপটাচারা কি এই সংঘে আছেন? আমরা কি তাঁর কাছে আজ ধর্ম উপদেশ পেতে পারি?'

'ঠিক সময়ে এসেছো তোমরা। এই সময় থেরী পটাচরা বেশিরভাগ দিনই তাঁর সান্ধ্য ধ্যানাদি সেরে বাইরে আসেন এবং অনেক সময় আগত ভিক্ষুণীদের ধর্মোপদেশ দেন। তোমরা চীবর পরিবর্তন করে হাত মুখ ধুয়ে এই চাতালে এসো। চাতালের বাইরে জলাধারে জল রাখা আছে। হাত ধোবার এবং পানীয় জলের পাত্র পৃথক। এসো! আমি তোমাদের তা দেখিয়ে দিচ্ছি। দুপুরের আহার করা হয়েছে তো? রাত্রে এই ভিক্ষুণীসংঘে বুদ্ধের অনুশাসন মেনে কঠিন খাদ্য নিষিদ্ধ। অসুস্থরা অবশ্য পথ্য হিসেবে দুধ খেতে পারবে।'

'তাহলে বোধিকে এক পাত্র দুধ দেবেন। সে আজ সকাল থেকেই পথশ্রমে বিশেষ অসুস্থ।'

'তোমরা দুজনেই দুধ খেতে পারো। বহুদূর পথ অতিক্রম করে এসেছো। গরম দুধ খেলে সুস্থ বোধ করবে, দুজনেই। আমি মধু মিশ্রিত দুধ নিয়ে চাতালে আসছি। তোমরাও তৈরি হয়ে এসো।'

চাতাল থেকে একটা বাঁক নিয়ে কোণাকুণি যে ঘরটি দেখা যায়, সেটি থেরী পটাচারার বাসস্থান। তিনি আজ চাতালে আসেননি দেখে, বোধি আর ইসিদাসী তাঁর ঘরে দেখা করতে গেল। বোধি শিহরিত হয়ে দেখল আরও তিনজন থেরী সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত আছেন। বোধি দেখেই চিনতে পারল, থেরী কুণ্ডলকেশাকে। সংঘে একমাত্র তাঁর মাথায়সামান্য কুঞ্চিত কেশ সবসময় দেখা যায়। বাকি দুজন একজন বৃদ্ধা ও কৃশ কিসাগৌতমী এবং অন্যজন অপরূপ সুন্দরী থেরী উৎপলবর্ণা। তাঁর গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। তাতে যেন নীল পদ্মের মতো জ্যোতি। তারা সকলে পরস্পর পরিচিত হল।

'আজ এক আশ্চর্য মনোরম সন্ধ্যা। এই কক্ষে আজ আমরা ছজন নারী উপস্থিত। পূর্ব জীবনে আমরা মায়া ও মোহের ছলনায় এবং ছয় রিপুর তাড়নায় অনেকবার দিকভ্রান্ত হয়ে অবশেষে এসে পৌঁছেছি বুদ্ধের চরণতলে। আজ আমি কোনো ধর্মকথা বলবো না, বরং আমরা আমাদের পূর্বজীবন-কথা আজ প্রত্যেকে সকলকে বলি এসো! আমরা কোনো কথা কেউ গোপন না করে, প্রত্যেকে নিজেদের কথা আলোচনা করলে, সকলেই মোক্ষমার্গে আরও উন্নীত হবো।'

সকলেই পটাচারার কথায় সমর্থন জানিয়ে বলল, "সাধু! সাধু!"

পটাচরা

*****

ঘরের মাঝখানে একটি দীপদানীতে একটিমাত্র দীপ জ্বলছে। বিহারে রাত ঘনিয়ে এসেছে। আজকের রাতটি তারা সকলে ধর্মালোচনা ও আত্মসমীক্ষায় কাটাবে স্থির করেছে। দীপের পাশে কয়েকটি পাহাড়ি পতঙ্গ উড়ছে। ঘরের দেওয়ালে পতঙ্গের ওড়ার ফলে ছায়াগুলি ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। যেন অনেক কালের অনেক প্রাচীন কথারা ঘোরাফেরা করছে ঘরের প্রকোষ্ঠটিতে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রিতে ছজন নারী মুখোমুখি বসেছে ধর্ম আলোচনায়। বাইরে সারাদিনের গুমোট গরমের পরে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে, চরাচরে নেমেছে নিঃসীম শান্তি। কেবল হাওয়া আর বৃষ্টি পড়ার শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। এবার বলবে পটাচরা। জ্ঞানী এবং বাগ্মী পটাচরাকে দেখে কে বলবে, সে একদিন উন্মাদ ছিল! যার কোমরে কাপড় পর্যন্ত থাকত না! পটাচারা সম্পর্কে সংঘে বহু গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। বেশিরভাগই পরস্পর বিরোধী। আজ মহামান্যার মুখ থেকে শুনে সকল বিতর্কের অবসান ঘটাতে চায় সকলে। সকলে নিবিষ্ট হয়ে শুনতে লাগল পটাচরার জীবন কাহিনী।

আমার দুর্ভাগ্যই আমাকে টেনে এনেছে বুদ্ধের কাছে। আমার জন্ম শ্রাবস্তী নগরে। আমার পিতা ছিলেন শ্রাবস্তী নগরের রাজার কোষাধ্যক্ষ। আমাদের তিন মহলা বাড়ি ছিল। ধন রত্ন প্রতিপত্তি কোনো কিছুরই অভাব ছিল না আমাদের। পিতা মাতার একমাত্র কন্যা সন্তান ছিলাম আমি, আর আমার এক ভাই ছিল। বাড়িতে অনেক যত্নে ও আদরে আমি পালিত হয়েছিলাম। পিতা আমাকে নানা শিক্ষায় পারদর্শী করেছিলেন। বাড়িতেই পণ্ডিত বেদবিদগণ আমাকে বেদ, সাংখ্য, দর্শন, ন্যায় ইত্যাদিতে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা সকলেই আমার স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানের প্রশংসা করতেন।

এক ধনী শ্রেষ্ঠী পরিবারে এরপর আমার বিবাহ ঠিক করা হল। তাঁরা থাকতেন সাকেত নগরে। শ্রাবস্তী থেকে সাকেত বেশি দূরের পথ নয়। আমার আশীর্বাদও হয়ে গেল। আমার শ্বশুরকুলের লোকজন সোনার সুপুরী ও অন্যান্য মাঙ্গলিক উপাচার নিয়ে এসে বহু কার্ষাপণ দিয়ে আমার পিতার কাছ থেকে আমাকে প্রথামত দাবী করলেন। পিতা সানন্দে সেই উপাচার গ্রহন করলেন। আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেল। এটিএকটি প্রথা, যা এখনও অনেক পরিবারে প্রচলিত আছে।

বিবাহ হতে তখন থেকে মাত্র একমাস বাকি। পিতা ও মাতা আমাকে তিন মহলা বাড়ির সব থেকে উঁচু মহলটিতে বন্ধ করে রাখলেন। এমনটাই সামাজিক নিয়ম। আশীর্বাদ হয়ে গেলে কন্যাদের এমনভাবেই পৃথক করে সাবধানে রাখা হয়। এই প্রথা খুব অপমানজনক। আমি শিক্ষিতা এবং মনের দিক থেকে উদার এবং বিচারশীল ছিলাম। আমি পিতার কাছে এই প্রথার প্রতিবাদ করলাম। আমার পক্ষে পরিবারে কেউ কোনো কথা বলল না। পিতার সঙ্গে আমার অনেক বাদানুবাদ হল। আমি অভিমানে সেদিন কিছু খেলাম না, একা শুয়ে রইলাম।

হঠাৎ দুপুরবেলা আমার ঘরের দরজা খুলে গেল। দেখলাম আমার ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাড়ির চাকর সখিয়। সে আমাদের বাড়ির রথের ঘোড়াদের দেখাশুনো করত আর ঘোড়াদের জন্য খাবার জন্য

ঘাস কাটার কাজ করত। সেদিন তার দুটি চোখে আমি দেখলাম মুগ্ধতা। সখিয় মাঝে মাঝেই আমার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে-একথা আমি জানতাম, তবে কখনও আমল দিইনি। আকাশের সুন্দর চাঁদের দিকে মানুষ যেমন মুগ্ধতা নিয়ে তাকায়, সখিয়র দৃষ্টি ছিল তেমন। আজ আমি সখিয়র দিকে চেয়ে দেখলাম, সে দেখতে বেশ সুন্দর। তার বলিষ্ঠ শরীর আর দুটি সরল চোখ আমার ভাল লাগল। সে আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। এমনভাবে সবার চোখ এড়িয়ে সখিয় এরপর মাঝে মাঝেই আমার বন্ধ ঘরে আসতে লাগল। আমাদের মধ্যে ভালবাসা আর নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে উঠল। দিন কেটে যেতে লাগল। আমার বিবাহের তখন মাত্র কয়েকদিনই বাকি ছিল। গভীর রাতে একদিন সখিয় আমার ঘরে এল। সে বলল, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।'

আমারও মনোভাব তাই। আমরা দুজনেই খুব কাঁদতে লাগলাম। আমি সখিয়র বুকে মাথা রেখে কাঁদছিলাম। প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে দুজনেই কাঁপছি, তবুও এক অদ্ভুত ভাললাগার আবেশ ছড়িয়ে পড়ছিল দেহ মনে। সেইরাতে আমরা মিলিত হলাম। উন্মত্ত আবেগে ভেসে গেল সমাজ সংসার, বাধা বিপত্তি সবকিছু। তারপর সেই রাতেই আমরা দুজন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। বিয়ে করে অপরিচিত একজনকে প্রতারণা করতে পারব না, তাই ঘর ছেড়েছিলাম। আমি জানতাম আমাদের এই সম্পর্ক আমাদের পরিবারের কেউ কখনও মেনে নেবে না।

অচীরাবতী নদীর অপর পারে একটি গভীর বন আছে। তার নাম জালিবন। আমরা সেখানে একটি ছোট কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থাকতে লাগলাম। চারিদিকে ঘনবন। রাত্রে হিংস্র জন্তুর ডাক শোনা যায়। মাঝে মাঝে হাতির ভয়ানক বৃংহণও কানে আসে। তবুও আমাদের সুখের সংসার গড়ে উঠল। আমার স্বামী আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসত। আমি তার জন্যই গভীর বনে কষ্ট সহ্য করে আছি, বলে তার মনে দুঃখের সীমা ছিল না।

আমাকে সুখে রাখার জন্য, সখিয় আয়ের ব্যবস্থা করতে জীবনপাত করে পরিশ্রম করতে লাগল। নদীর ধার থেকে সে কচি ঘাস কেটে নিয়ে যেত নগরে, তা উচ্চ মূল্যে নগরের শ্রেষ্ঠীরা কিনে নিত, কারণ শ্রেষ্ঠীদের রথের ঘোড়াদের জন্য রোজ ঘাসের দরকার হত। এভাবেই আমাদের দিন কাটতে লাগল। বনের ফল মূল, পাখির মাংস, নদীর মাছ আমাদের খাদ্যেরও কোনো অভাব ছিল না। এর মধ্যে আমার একটি সুন্দর পুত্র সন্তান জন্মালো।

আমার পুত্রটি বড় শান্ত স্বভাবের হয়েছিল। এর কিছুদিনের মধ্যে আমি আবার সন্তানসম্ভবা হলাম। প্রথমবার সন্তান হবার সময় আমি বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। একাকী সারাদিন বনে থাকতে আমি খুব ভয়ও পেতাম। এবার ঠিক করলাম আমি যেমন করেই হোক, পিতা মাতার কাছে গিয়ে থাকব। সখিয় আমাকে সেখানে যেতে বিশেষ করে বারণ করল। হয়তো সে ভেবেছিল, ওখানে গেলে আমার পিতা মাতা আর আমাকে ওর কাছে ফিরে আসতে দেবেন না। স্বামীর আপত্তিতে আমি সেখানেই থেকে গেলাম।

প্রসব বেদনা শুরু হল যেদিন, সেদিনটা আমি কখনও ভুলতে পারব না। গহীন বনের ভেতর অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। আমি প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি। আমার পাতার ঘরের চাল ফুটো হয়ে গেছিল, সেখান থেকে আমার গায়ে জল পড়ছিল। ঘরও ঝড়ে দুলছিল। এইজন্য আমি সখিয়কে অনেক গঞ্জনা দিলাম। আমার সেই কটু কথা

শুনে, ঝড় জলের মধ্যেই সে বনের ভেতর থেকে মজবুত বাঁশ কেটে আনতে চলে গেল। যা দিয়ে ঘরের খুঁটি তৈরি হবে।

এদিকে ঝড় ও বৃষ্টি ক্রমে বাড়তে লাগল। সে যে কী ভয়ানক বৃষ্টি! তা বলে বোঝাতে পারব না। বাজ পড়তে লাগল কড়কড় শব্দে। বড় বড় গাছগুলো যেন আমাদের বনের ভেতর পিষে মেরে ফেলবে। আমি যন্ত্রণার মধ্যেও স্বামীর চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। শেষরাতে আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, কিন্তু স্বামী তখনও ফিরে এল না। প্রবল চিন্তায় তখন প্রায় আমার শ্বাসরোধ হয়ে যাচ্ছে। আমি কোনোক্রমে বিছানা থেকে উঠে দুটি সন্তানকে কোলে করে বনের ভেতর প্রবেশ করলাম। বহুক্ষণ ধরে তাকে খোঁজার পর, একটি বাঁশঝাঁড়ের কাছে আমার স্বামীর মৃতদেহ দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম সে সর্প দংশনে মারা গেছে। সম্ভবত ঝড়ের রাতেই সে মারা গেছিল। এ কী ভয়ানক বিপর্যয়!

শোকে দুঃখে বিহ্বল আমি নিজেকে শত ধিক্কার দিতে লাগলাম। ভাবলাম, এ কী করলাম আমি? কেন তাকে অনুযোগ করতে গেলাম! সে যেতে চাইলে, কেন তাকে গভীর বনে রাতে একাকী যেতে দিলাম? যদি অনুযোগ না করতাম, সে আজ বেঁচে থাকত। এতবড় আঘাতে আমার শরীর মন একেবারে ভেঙে পড়ল। তবুও এতকিছুর পরেও আমার সন্তানদের চিন্তা মন থেকে গেল না।

অবশেষে ঠিক করলাম, যেমন করেই হোক আমার সন্তানদের বড় করে তুলব, এবং সেইজন্য পিতার গৃহে আবার ফিরে যাব। নিশ্চয় একবার সেখানে গেলে তাঁরা আমার সন্তানদের মুখ চেয়ে আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। ফিরে যেতে হলে নদী পার হতে হবে। বনের কাছের ছোট নদীটি গতরাতের বর্ষায় ফুলে ফেঁপে উঠে তখন প্রবল বেগে বইছে। দুটি সন্তান নিয়ে জলে নামতে পারলাম না। বড় ছেলেটিকে পাড়ে বসিয়ে রেখে, আমি ছোট ছেলেকে একটি ঝুড়িতে শুইয়ে মাথায় নিয়ে নদী পার হতে লাগলাম। কোথা থেকে একটি বিশাল বাজপাখি উড়ে এসে আমার সদ্যোজাত সন্তানটিকে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল। আমি সজোরে হাততালি দিয়ে বাজপাখিটির কাছ থেকে আমার সন্তানকে ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার বড় ছেলে ভাবল চিৎকার করে আমি তাকে আমার কাছে ডাকছি। সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং তক্ষুণি ডুবে মারা গেল। দুই ছেলের কাউকেই আমি বাঁচাতে পারলাম না। আমার দোষে আমি সেদিন স্বামী ও দুই সন্তানকে হারালাম।

নদীর পাড়ে হতচৈতন্য হয়ে বসেছিলাম। তখনও আমার দুর্ভাগ্যের আরও খানিকটা অবশিষ্ট ছিল। একজন পথিক আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি বললেন গতরাতের দুর্যোগে আমাদের বাড়িটি ভেঙে পড়েছে, এবং আমার মা বাবা ও ভাই দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গেছেন। আমি সেই পথিকের কথা বিশ্বাস করলাম না। নদী পার হয়ে সন্নিহিত শ্মশানে এসে দেখলাম, চিতার উপর আমার মা বাবা ও ভাইয়ের মৃতদেহ শায়িত আছে। তারপর তাদের চিতাতে অগ্নিসংযোগ করা হল এবং চিতা জ্বলে উঠল। আমি কাঁদতেও ভুলে গেলাম। স্থির বিশ্বাস হল এই সমস্ত ঘটনা সাজানো, কোনোটাই সত্যি নয়। হঠাৎ হাসতে লাগলাম পাগলের মত। আমার গায়ের কাপড় সরে গেল, তবুও হাসতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, ‘সব ভুল! সব মিথ্যে! সবই আমাকে ঠকানোর ষড়যন্ত্র!’

লোকজন বলতে লাগল, এত শোক আমার মস্তিষ্ক গ্রহন করতে পারেনি। আমি পাগল হয়ে গেছি!

আমার উর্ধাঙ্গের বসন খসে পড়লেও আমার বোধ এতটুকু জাগ্রত হল না। এক সময় আমার কোমরেও কাপড় থাকল না। উন্মাদ ও উলঙ্গ হয়ে আমি নগরের পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। কটি বস্ত্রও চ্যুত হওয়ায় আমার নাম হল, পট্টাচরা (পট্ট অথবা বস্ত্র + অচরা অথবা ধারণ না করা) বা সংক্ষেপে পটাচরা।

একদিন আমি ঘুরতে ঘুরতে জেতবন বিহারে এসে উপস্থিত হলাম। সেই উদ্যানে বুদ্ধ তখন বহু ভক্ত সমাগমে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। আপন খেয়ালে আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্রোতাগণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই পাগলিনীকে এখনই বিহার থেকে বের করে দেওয়া হোক!'

বুদ্ধ তা শুনতে পেয়ে বললেন, 'ওকে বাধা দিও না। এখানে আসতে দাও!'

আমি ভগবানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভগবানকে দেখে আমার স্মৃতি তখনও ফিরে আসেনি, তবে আমার বহুদিনের পুরনো সমস্ত শোক যেন একসঙ্গে ফিরে এল। বহুদিন পরে এক ভীষণ দুঃখের অনুভূতি হল আমার। এত শোকেও এতদিন আমি কেবল হেসেছি। এতদিন পর এক ভীষণ প্লাবনের মত শোক জাগ্রত হল আমার মধ্যে। ভীষণ কষ্টে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। তবে কেন কাঁদছি? সেই বোধ তখনও ফিরে আসেনি আমার স্মৃতিতে। আমি এতদিন কাঁদতে ভুলে গেছিলাম। সেই আমি অঝোরে কেঁদে যেতেলাগলাম। বুদ্ধ আমাকে বললেন, 'ভগিনী! তুমি তোমার স্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হও।'

বুদ্ধের অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে আমার সব কথা মনে পড়ে গেল। বোধ জাগ্রত হতে দেখলাম আমি বিবসনা। আমি সঙ্কুচিত হয়ে বসে পড়লাম। একজন আমাকে তার উত্তরীয় দান করল। আমি সেটিকে গায়ে জড়িয়ে বুদ্ধের চরণ বন্দনা করলাম। বুদ্ধ বললেন, 'পটাচরা হৃতধনের উদ্ধার অসম্ভব। এখন যে সন্তানদের জন্য অশ্রুপাত করছো, সহস্র জন্মে এমন অসংখ্যবার করেছো। শোকমগ্ন হয়ে এই দুর্লভ মানব জন্ম কেন নষ্ট করছো? তোমার মৃত আত্মীয়রা মুক্তির পথে তোমার কোনো সাহায্য করতে পারবে না। এই পরম সত্য উপলব্ধি করে সত্বর নির্বাণের পথে অগ্রসর হও।'

তারপর জীবনের কালো ও দীর্ঘ অধ্যায়গুলি শেষ করে আমি প্রবেশ করলাম আলোর পথে। প্রব্রজ্যা লাভ করে ভগবানের চরণে আশ্রয় পেলাম। আমি এক নবজন্ম পেলাম। অতীতের দীর্ঘ অধ্যায়গুলো এখন ছায়ার মত কোথায় হারিয়ে গেছে!

পটাচরার কথার মধ্যে এমন এক মাধুর্য্য ছিল যে সকলে একমনে কেবল শুনেছে। পটাচরার নির্দেশে এবার নিজের গল্প শোনাবে উৎপলবর্ণা।

উৎপলবর্ণা

*****

তার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, দুটি চোখ যেন পদ্মের মত সুবিশাল ও গভীর, এবং তা অদ্ভুত উজ্জ্বল ও শান্ত। উৎপলবর্ণার চোখের দিকে সাধারণ মানুষ বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারবে না। সাধনালব্ধ এক অপূর্ব আলোয় তার দুটি চোখ আলোকিত, সেখানে ক্ষুদ্র কোনো চাওয়া পাওয়া নেই। সে বলতে শুরু করল তার কথা।

সকলেই সহজ সরল ভাষায় তাদের অকপট জীবনকাহিনী বলে চলেছে সকলের সামনে। উৎপলবর্ণার উদাত্ত কণ্ঠস্বর গভীর রাত্রির নৈশব্দকে যেন ভেঙে খান খান করে দিতে লাগল।বাইরে তখন আবার সজোরে বর্ষা নেমেছে।

আমার পিতা ছিলেন শ্রাবস্তীর বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী, কিন্তু মাতা ছিলেন বারবণিতা। মাতা অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। তাঁর রূপের অংশ পেয়েছিলাম আমিও, আর তাতেই ঘটে গেল সর্বনাশ। কামুক ব্যক্তিরা বালিকা অবস্থায়ই আমাকে এবং সেইসঙ্গে আমার মাকে, দুজনকেই কামনা করতেন। সেই পতিতালয়ে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসত। আমার পিতা পরম দয়ালু, তিনি আমাকে সেই পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তি দিলেন। আমাকে একদিন তিনি তাঁর সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন, আমার শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। সমাজের সকলের কাছে আমার পরিচয় করালেন– উৎপলবর্ণা শ্রেষ্ঠীকন্যা, সে সামান্যা নর্তকী নয়।

আমি যেন মুক্তি পেলাম। আমি নিজের অতীতকে ভুলে নতুন করে জীবন শুরু করলাম। শিক্ষায় মনোনিবেশ করলাম। এরপর যৌবনে প্রবেশ করলে, পিতা আমার বিবাহ ঠিক করলেন। এরপরেই শুরু হল বিরোধিতা। বিবাহ ঠিক করা মাত্র সমাজের উচ্চপদস্থ মানুষেরা প্রতিবাদ করলেন, আমি বারবণিতার কন্যা, সুতরাং আমার বিবাহ দেওয়া যাবে না। আমাকে হয় বারবণিতা, নাহলে জনপদবধূ হয়ে সকল পুরুষের ভোগ্যা হতে হবে। পিতা তবুও জোর করে আমার বিবাহ স্থির করলেন। পাত্র পিতার অধীনে কাজ করতেন, তাই তিনি আমাকে বিবাহ করতে আপত্তি করেননি। এই সময় আমাদের বাড়িটি ঘিরে ফেলা হয়। যাতে কিছুতেই আমার বিবাহ না হতে পারে। পিতা বুঝলেন এই মুহূর্তে কিছু একটা করতে হবে। তিনি আমাকে ডাকলেন।

‘মা আমি চাই না, তুমি সর্বজনভোগ্যা হয়ে সারাজীবন ধরেকেবল দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করো। তুমি কি বৌদ্ধ সংঘে গিয়ে প্রব্রজ্যা নিতে আগ্রহী? তবে সেখানে যাও! পালিয়ে যাও এই পঙ্কিলতা থেকে। আমি নিজে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেব।’

আমি তখন গায়ে কালিঝুলি মেখে মলিন বস্ত্র পরে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলাম ভিক্ষুণী বিহারে। সেখানে আমার প্রব্রজ্যা হয়ে গেল। এক পঙ্কিল জীবন থেকে অতিকষ্টে মুক্তি পেলাম আমি। প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর আমার নিজের শরীরকে ঘৃণিত মনে হত, কারণ এই শরীর মানুষের মনে লালসার উদ্রেক ঘটায়।

আমি ঘন বনের ভেতর নির্জনে ধ্যান করতাম। আনাপান স্মৃতি ধ্যান অভ্যাসের ফলে নিজের শরীরের উপর একধরণের মায়াহীনতা এসেছিল। দিবারাত্রি ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে থাকতাম। সাধনমার্গে যখন বেশ অগ্রসর হয়েছি, তখন হঠাৎ একদিন একটি বিপদ ঘটল আমার। আমার মামাতো ভাই নন্দিয় বরাবর আমার প্রতি আসক্ত ছিল। তাকে কখনও আমি গুরুত্ব দিতাম না। আমি প্রব্রজ্যা নিলেও সে তারপরেও আমাকে কামনা করত। একদিন আমি যখন নির্জনে ধ্যান সাধনা করছি, সে এসে আমার শয়ন আসনের তলায় লুকিয়ে রইল। আমি রাতে ধ্যানে বসতেই, সে আমাকে আক্রমণ করল।

‘আমি বাধা দিলাম, গায়ের জোরে না পেরে, অনেক মিনতি করলাম, তবুও সে আমাকে ছাড়ল না। তার লালসার কাছে আমি পরাজিত হলাম এবং সে আমার সতীত্ব নষ্ট করল। আমি নষ্ট হলাম। তার কাছ থেকে কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারলাম না। সকাল হতেই সেই দুর্বৃত্ত পালিয়ে গেল। আমি ছেড়া চীবর শরীরে

জড়িয়ে কোনোমতে গিয়ে ভিক্ষুণীদের সব জানালাম। তাঁরা তক্ষুণি বুদ্ধকে গিয়ে বিষয়টি জানালেন। ভেবেছিলাম এবার আমাকে সংঘ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। ভীষণ হতাশায় আমার ভেতর জীবন নাশের ইচ্ছা জেগে উঠল। কিন্তু বুদ্ধের স্নেহভরা বাক্য আমাকে আবার জীবনের পথে ফিরিয়ে আনল। তিনি সত্যদ্রষ্টা, তাই তিনি বুঝলেন আমাকে। বললেন, 'তোমার ভেতর যে মহান শক্তি আছে, তা এই দেহের থেকে অনেক বড়। দেহে যেমন কীট পতঙ্গ হাঁটে এই ঘটনাকেও তেমনই মনে করো। হতাশ হয়ো না, তুমি চির পবিত্র। কেউ কখনও তোমার পবিত্রতার হানি ঘটাতে পারবে না। তবে গভীর বনে সাধনা আজ থেকে ভিক্ষুণীদের জন্য বন্ধ করা হল। এটা তাদের নিরাপত্তার কারণেই করা হল।'

এরপর বুদ্ধের কৃপায় আমি সাধনায় অনেক উন্নতি করলাম। খেচরী সিদ্ধি লাভ করার পর, আমি শ্রাবস্তীতে বিরুদ্ধবাদীদের পরাস্ত করতে পুরুষের বেশে নিজের সাধন বিভূতি প্রদর্শন করেছিলাম। সে ছিল এক অদ্ভুত দিন ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা তখন সংঘের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত শুরু করেছিল। সুন্দরী নামের একজন নর্তকীকে হত্যা করা হয়, শ্রাবস্তীতে। তারপর তার দেহ জেতবন বিহারের মাটির তলায় পুঁতে ফেলা হয়। এরপর বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে সেই হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। বুদ্ধ সকলকে সাধনলব্ধ বিভূতির প্রদর্শন করতে বারণ করেন, তবে সেইদিন বুদ্ধও বাধ্য হয়ে পরিস্থিতির চাপে তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখিয়েছিলেন গণ্ডম্ব আমগাছের তলায়। গণ্ডম্ব নামক রাজার মালির বাড়ির একটি আম খেয়ে সেই মুহূর্তে তার বীজ থেকে একটি সুবিশাল চারা সৃষ্টি করেন বুদ্ধ তারপর সেই সুবিশাল ফলন্ত আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাঁর যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করেছিলেন। সেই বিশেষ অবিশ্বাস্য দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন এবং সেই গল্প সংঘের সকলেই জানেন। নিজের জীবনকথা বলতে গিয়ে তা আর বলছি না। আমি সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে শ্রাবস্তীতে এসেছিলাম। তারপর আমিও সেখানে আমার ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শন করি। সেদিনের পর থেকে বিরুদ্ধবাদীরা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান। অনেকেই বুদ্ধের কাছে তাঁদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বুদ্ধের কৃপায় আজ আমি আষব মুক্ত, ষড় অভিজ্ঞায় পারদর্শিনী।

কুন্ডলকেশা

****

পরের বক্তা কুণ্ডলকেশা। সে দীর্ঘাঙ্গী, তার গায়ের রং চাপাফুলের মতো উজ্জ্বল, এক কথায় সে অপরূপ সুন্দরী, কিন্তু তার মুখে একধরণের দৃঢ়তা ও কাঠিন্য আছে। যা দেখে বোঝা যায়, সে সামান্যা নয়।

আমার নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজেই করেছি। আমি রাজগৃহের রাজ কোষাধ্যক্ষের মেয়ে ভদ্রা। একদিন জানলায় চোখ রেখে দেখলাম, রাজপুরোহিতের পুত্র সত্থুককে বেঁধে নিয়ে চলেছে রাজকর্মচারীরা। আমি তখন জানতে চাইলাম, 'সত্থুকের অপরাধ কী?' উত্তর পেলাম–চুরির অপরাধে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমিতে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। শুনে আমি তাকালাম বন্দীটির দিকে। তার দুটি চোখ দেখে আমার বুকের ভেতর কী যেন হয়ে গেল। আমি মায়ায় আবদ্ধ হলাম। মনে হল যে করেই হোক, ওকে বাঁচাতে হবে। আমি বরাবরই স্বাধীনচেতা। যা মনে হয়, তাই করতে আমি ভালবাসি। ছুটে গেলাম পিতার কাছে। বললাম এই বন্দী নির্দোষ। যেমন করে হোক একে বাঁচাতেই হবে। পিতা বহু স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সত্থুককে মুক্ত করে

দিলেন। সে প্রাণভিক্ষা পেল। আমি পিতা মাতাকে বললাম, 'আমি এই সখুককে স্বামী হিসেবে গ্রহন করতে চাই।'

কৃতজ্ঞ সখুকও আমার প্রস্তাবে রাজি হল। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। পিতা মাতা প্রথমে মেনে নিতে চাননি। একেই সে ছিল অভিযুক্ত, তার উপর বিদেশী। তবুও আমার জেদের কাছে ওঁরা হার মানলেন। সখুক আমাকে নিয়ে দূরদেশে যাত্রা করবে বলে রথে উঠল। আমি বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে এসেছিলাম। হঠাৎ রথ থামিয়ে দিল সখুক। বলল, 'ভদ্রা! নগর রক্ষীরা যখন আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই পর্বতরাজির দিকে চেয়ে অঙ্গীকার করেছিলাম, যদি কখনও প্রাণরক্ষা হয়, অর্ঘ্য দিয়ে এই পর্বতশ্রেনীর পুজো করবো। তুমি অর্ঘ্য প্রস্তুত করো।'

স্বামীর কথা অনুযায়ী আমি অর্ঘ্য প্রস্তুত করলাম। সেই পাহাড়ের নীচে কাঠ জ্বেলে রান্না করলাম। তারপর তা থালায় ঢেলে দেবতার উদ্দেশ্যে সাজিয়ে দিলাম। আমরা রথে চড়ে কিছুটা পথ গেলাম। তারপর সখুক আমাকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। পথ ছিল খুবই নির্জন। সখুক আমাকে অলঙ্কারগুলি খুলে তার হাতে দিতে বলল। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো দস্যু তস্করের ভয়ে সে এমন বলছে। পরক্ষণেই মনে হল, অলঙ্কারগুলি নিয়ে সখুক আমাকে এই নির্জন পথে মেরে ফেলবে না তো? সত্যিই কি সে তস্কর ছিল? আমি কি ভুল মানুষের জীবন দান করেছি?

'কেন? তুমি এখন অলঙ্কার দিয়ে কী করবে?'

'তুমি বড়ো প্রশ্ন করো। তাড়াতাড়ি অলঙ্কারগুলো দিয়ে আমাকে মুক্তি দাও।'

'সেকী! তুমি কি কেবল আমাকে অলঙ্কারের লোভে বিবাহ করেছো?'

'তা আমি জানি না। তবে অলঙ্কার ছাড়া আমার কাছে তোমার কোনো মূল্য নেই। তোমাকে এই পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলেই দিতাম, তবুও প্রাণ রক্ষা করলাম–কারণ তুমি আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলে। এখন ফিরে যাও আর আমাকে মুক্তি দাও!'

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম ভুল লোককে নিজের স্বামী হিসেবে নির্বাচন করেছি। মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করলাম কী করতে হবে। আমি মিথ্যে অভিনয় করে চোখে জল এনে বললাম, 'ঠিক আছে। কেবল একবার তোমাকে আলিঙ্গন করতে চাই। তারপর আমার অলঙ্কার সব তোমাকে দিয়ে আমি চলে যাব।'

আমার স্বামী রাজি হল। আমি তাকে বুকে চেপে ধরে, একমুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দিলাম।

মানুষের কদর্য চরিত্র, আমাকে সংসারের প্রতি মোহশূন্য করে তুলেছিল। সেই পাহাড়ে তখন জৈন ধর্মাবলম্বী কিছু মানুষ বসেছিলেন। আমি ঘরে না ফিরে, তাদের সংঘভুক্ত হলাম। তাঁরা তাল পাতার কাঁটা দিয়ে আমার সমস্ত কেশ উৎপাটিত করে দিলেন। তবুও কুণ্ডলাকারে আবার কেশের আবির্ভাব হল। সেই থেকে আমি ভদ্রা নয়, কুণ্ডলকেশা নামে পরিচিতা হলাম। সেখানে আমি বহু পুথিপত্র পড়লাম, তবু মনে এতটুকু শান্তি পেলাম না। তখন আমি সেই সংঘ পরিত্যাগ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বিভিন্ন মানুষকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে পরাজিত করাই আমার এক ধরণের নেশা হয়ে গেল।

আমি পথের পাশে জামের ডাল পুঁতে মানুষকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করতাম। জম্বুদ্বীপে সেরা তার্কিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলাম আমি। অবশেষে একদিন শ্রাবস্তী নগরে এসে পৌঁছলাম আমি। এসেই পথের একপাশে জামগাছের একটি শাখা প্রোথিত করে বললাম, 'যে এই পথে যাবে, তাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, তার পর যেতে হবে।'

সেই পথে যাচ্ছিলেন তখন স্থবির সারিপুত্র। তিনি ধ্যানসুখে তন্ময় হয়ে পথে বিচরণ করেন। মাটিতে কোথায় তাঁর পা পড়েছে তা তিনি খেয়ালই করেননি। তাঁর পা আমার জামগাছের ডাল স্পর্শ করতে তিনি বাধ্য হলেন আমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে। আমি প্রথমে সারিপুত্রকে অনেক প্রশ্ন করলাম। প্রতিটা প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিলেন তিনি। শেষে তিনি আমাকে একটিই প্রশ্ন করলেন। বললেন, 'বলো তো, 'একটি জিনিস' কী?'

এর উত্তর আমার জানা ছিল না। আমি মাথা নত করলাম। তখন সারিপুত্র উত্তরে বললেন, 'একটি জিনিস হল আহার। সকল প্রাণী হল আহারের উপর নির্ভরশীল।'

আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম, আমি আপনার শরণ নিতে চাই।' সারিপুত্র বললেন, 'তুমি ভগবান বুদ্ধের শরণ নাও। তিনি দেব ও মনুষ্যলোকের সর্বপ্রধান।'

আমি ছুটে গেলাম বুদ্ধের কাছে। বহু পথ ঘুরে অবশেষে তাঁর সাক্ষাত পেলাম। সেই অমিতাভ বুদ্ধের চরণে নিজেকে তারপর সঁপে দিলাম। তিনি আমাকে প্রব্রজ্যা দিলেন। আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ভদ্রে! তুমি শ্রদ্ধাভরে প্রব্রজ্যা নিয়েছো। যা পরম আনন্দ, সর্বান্তকরণে তাতে নিয়োজিত হও। মঙ্গলের অনুশীলনপূর্বক শান্তির পথে অগ্রসর হও।'

ইসিদাসী

*****

'এতক্ষণ তোমরা আমাদের চারজনের কথা শুনেছো। এবার আমরা তোমাদের দুজনের কথা শুনবো। তোমাদের জীবনের কথাও আমাদের ধর্মপথে উদ্দীপনা দেবে। বলো ইসিদাসী তোমার পূর্বজীবনের কথা, আগে তুমি বলো, এবং নিঃসঙ্কোচে বলো। আমরা সকলেই একই পথে যাত্রা করেছি। যা ত্যাগের পথ, সত্য ও মঙ্গলের পথ। আমাদের অতীত অন্ধকার বলেই তো আমরা আলোর খোঁজে এসেছি!'

আমি বিহার পরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম। এবার জেতবনে ফিরে যাব। শুনেছি বুদ্ধ এখন ওখানেই আছেন। তাঁর দর্শন বেশি পাইনি। তবে আজ আপনাদের জীবন কথা শোনার সৌভাগ্য হল। আজকের রাতের কথা আমি সারাজীবনে ভুলবো না। আমি বেশ কিছু বছর হয়েছে বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করেছি। থেরী জীনদত্তার কাছ থেকে আমি অভিষেক গ্রহন করে ভিক্ষুণী হয়েছি। সাধন পথে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারিনি। তবে রোজ ধ্যানাভ্যাস করে থাকি।

আমি এক অতি সামান্যা হতভাগিনী নারী। আমার বাড়ি ছিল উজ্জয়িনী নগরে। আমার পিতা ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দানশীল এক ব্যক্তি। সাকেত নগরের এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী পরিবারে আমার বিবাহ হয়। বিয়ের পর সংসারের যাবতীয় কাজ আমি হাসিমুখে করতাম।

শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, পরিজনবর্গ কাউকে কখনও অমর্যাদা করিনি। অনলসভাবে পতিসেবা করেছি। আসলে আমার মতো পরিচারিকা এ জগতে দুর্লভ। প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে আমি ঘরের সব কাজ করতাম। তবু কোন এক অজানা কারণে আমার স্বামী আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি জানালেন, তিনি আমাকে ত্যাগ করতে চান। একদিন সজল নয়নে আমার শ্বশুর, শাশুড়ি আমাকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

পিতা আমি ফিরে আসতেই আমার আবার বিয়ে দিলেন। সেখান থেকেও আমি এক মাসের মধ্যে বিতাড়িত হলাম। অথচ সেখানেও সবার খুব সেবা করেছিলাম। ফিরে আসার পর আমাকে নিয়ে আমার পিতা খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। শেষে একদিন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অনেক ধনসম্পদের লোভ দেখিয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজি করানো হল।

সেই বিয়েও আমার জীবনে স্থায়ী হল না। ভিক্ষুটি চীবর ত্যাগ করে সংসারে প্রবেশ করলেও সংসারকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করত। মাত্র পনেরোদিন কাটতেই তার কাছে এই সংসার জীবন অসহনীয় হল। সে পুনরায় সংঘে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাকে ঘৃণা সহকারে ত্যাগ করল।
এবার আমার মন সত্যিই ভেঙে গেল। এত প্রত্যাখ্যান সহ্য করে নিজেকে খুব ঘৃণ্য মনে হল। ভাবলাম এই সংসারে আর থাকবো না। সেই সময় আমাদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন ভিক্ষুণী জীনদত্তা। তাঁর শান্ত ও সৌম্য মূর্তি দেখে আমার মন শান্ত হল। আমি জীনদত্তার কাছে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলাম। আমি এতদিন কেবল সংসার করতেই চেয়েছিলাম, তবু সংসার আমাকে প্রাণপনে দূরে ঠেলেছে, কারণ আমার অজান্তেই আমার জন্য ত্যাগের এক অপূর্ব জীবন অপেক্ষা করছিল। এখন বুঝলাম সংসার কেবল দুঃখের কারাগার, আর বুদ্ধ স্বয়ং কৃপা করে এই দুঃখিনীকে সেই কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। আমার ভিক্ষুণী জীবনে একবারই তাঁর দর্শনলাভ করেছি। একবার তাঁকে দর্শনের বড়ো সাধ হয়েছে, আমার।

‘আমরাও কাল সকলে জেতবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। তোমরা চাইলে আমাদের সঙ্গী হতে পারো।’

সকলে এবার বোধির দিকে তাকালেন।

বোধি

***

‘বলো নবীন ভিক্ষুণী! তোমার কথা এবার শোনা যাক।’

আমার তেমন কোনো কথা নেই। এত খ্যাতনামা থেরীদের সামনে বলার মতো কিছুই নেই আমার। আমি কেবল শ্রোতা হয়েই থাকতে চাই। মহাবোধিজ্ঞান লাভ করতে সংঘে প্রবেশ করেছি। আমার মাতা ছিলেন, একটি ধনী পরিবারের ক্রীতদাসী। সেখান থেকে মা একদিন মুক্তিলাভ করলেন। মুক্তি পেয়েই মা এসে সংঘে

যোগ দিয়েছিলেন। আমিও শিশু অবস্থা থেকে তাই সংঘে থাকতে লাগলাম। বুদ্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মা আমার নাম রেখেছেন বোধি। মা মারা যাবার পর আমি সংঘে আশ্রয় নিয়েছিলাম দারিদ্র ও অসম্মান থেকে বাঁচতে। তবে প্রব্রজ্যা তার থেকে আরও অনেক মহান, ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিতে তাকে বাঁধা যায় না। আজ বুঝতে পারছি, ভাগ্যিস দুর্ভাগ্যের কবলে ছিলাম! তাই তো বুদ্ধ করুণা করে আমাকে তাঁর কোলে টেনে নিয়েছেন। তাঁরই অপার কৃপায় আজ আপনাদের সবার কথা শুনতে পেলাম।

এখন বুঝতে পারছি, সকলের জীবনে দুঃখের পরিধি সুবিশাল। ব্যথার পূজার অন্তেই আলোকিত নির্বাণ অপেক্ষা করে থাকে। দুঃখের আগুনে পুড়েই মানবমন সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
ভোর হয়ে আসছে। ভোরের আলো গায়ে মেখে দ্রুত পথ চলেছেন ছয় পুণ্যা নারী। তাঁরা বুদ্ধের দর্শনলাভের মানসে এগিয়ে চলেছেন, আর তাঁদের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে আলোকিত একটি মেঘমুক্ত ভোর।

কিসা গৌতমীর গল্প

****

ফিসফিস করে যেন আপন মনে কথা বলতে শুরু করল বৃদ্ধা গৌতমী। কথা বলার সময় তার স্বর কাঁপে। বয়সের তুলনায় শরীরও অনেক বেশি ক্ষয়াটে হয়েছে তার। নিজের উপর সারা জীবন কম অত্যাচার হয়নি। এবার সে বলতে লাগল,তার নিজের কথা।

আমার নাম গৌতমী। শরীর আমার অতি কৃশ, তাই লোকে আমাকে বলতো কৃশা বা কিসা গৌতমী।

আমার জীবন সুখের ছিল না। আমি বড় দুঃখিনী নারী। আমি বোধিসত্ত্বকে আগে থেকে চিনতাম না, সম্পর্কে সে আমার দূরসম্পর্কের মাতুল পুত্র হয়। তবে সে ছিল রাজার ছেলে আর আমি হলাম সাধারণ প্রজা। তাই মুখোমুখি কখনও আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি। বিয়ের কিছুদিন পর সন্তানহীনা এবং কুৎসিত ও কৃশ আমাকে আমার স্বামী দূর করে দিলেন। পিতা মাতাকে আগেই হারিয়েছিলাম। স্বামীর সুবিশাল প্রাসাদেও আমার আর স্থান হল না। আমাদের বাড়ির দাস দাসীদের জন্য যে নীচু কুঁড়েঘরগুলি ছিল, তার একটাতে আশ্রয় পেয়ে, অনাথাদের মতো সেখানেই থাকতে লাগলাম।

সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুল কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহন করলে, সিদ্ধার্থকে খবর দেওয়া হল। সে তখন কিছুটা দূরে প্রমোদ উদ্যানে বাস করছিল। রাজার আদেশে দিবারাত্রি সেখানে নাচ, গান আর নাট্যশালার আসর বসানো হয়েছিল, যাতে রাজপুত্রের মুখ ভোগ্যবস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু তাই কখনও আবার হয় নাকি? সিদ্ধার্থের মন ছিল উঁচু তারে বাঁধা। তাঁকে যতই বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করা হোক না কেন, তা কেবলই তুচ্ছ হয়ে যায়। পুত্র সন্তান জন্মানোর সংবাদ পেয়ে সিদ্ধার্থ সোনার কারুকার্য করা এক অপূর্ব রথে চড়ে তাঁর প্রাসাদের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। সেইসময় আমি আমার কুঁড়েঘরের সামনে রাস্তার উপর পড়ে থাকা রাশিকৃত শুকনো পাতা ঝাঁট দিচ্ছিলাম। দূর থেকে অপরূপ সুন্দর সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আমি তাঁকে দেখে পলক ফেলতেও ভুলে গেলাম। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘদেহী এক অসামান্য যুবক! রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে দেখতে

দেখতে আমার মুখ থেকে বেখেয়ালে কয়েকটি কথা বেরিয়ে এল। মুখে মুখেই রচনা করে ফেললাম একটি গাঁথা।

‘নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতো নূন সো পিতা।
নিব্বতা নূন সা নারী, যস্সায়ং ঈদিসো পতী তি॥’

অর্থাৎ যে মাতা পিতার এমন পুত্র, যে নারীর এমন স্বামী, তাঁরা নিশ্চয়ই পরম সুখী!
দূর থেকে তখন সিদ্ধার্থ আমার অনেকটা কাছে চলে এসেছেন। তিনি আমার গাঁথাটি শুনতেও পেলেন। কিন্তু তিনি নিব্বতে বা সুখীর পরিবর্তে, শুনলেন নিব্বাণ বা মুক্তি, কারণ তখন তিনি দিবারাত্রি সংসার ও দুঃখ জ্বালা থেকে মুক্তির কথাই ভাবছিলেন। শুনেই রথ থেকে নেমে এলেন সিদ্ধার্থ। তারপর আমাকে বললেন, ‘কী আশ্চর্য গাঁথাটি বলেছো তুমি! আমার পিতা, মাতা ও স্ত্রী সকলেই নির্বাণ লাভ করবে! আশ্চর্য! অসাধারণ তোমার কথা। ধন্য তুমি। তোমার এই গাঁথাটিকে যেন আমার একটি উপদেশবাণীর মত মনে হচ্ছে!’

আমি তখন খানিকটা আনন্দে খানিকটা ভয়ে তাকিয়ে আছি সেই অনির্বচনীয় রূপবান মানুষটির দিকে। ভাবছিলাম, যেমন এঁর রূপ তেমনই সদাশয় এই মানুষটি! গরীবের প্রতি কত সদয় এঁর মন! এমন সময় সিদ্ধার্থ আনন্দিত মনে রথে উঠে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তাঁর রথের সারথী হঠাৎ ছুটে এসে,আমাকে সিদ্ধার্থের গলার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের অপরূপ মুক্তার মালাটি উপহার দিয়ে, বলে গেল, এটি সিদ্ধার্থ আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমার মন তা শুনে দারুণ আনন্দে ভরে গেল। ভাবলাম সিদ্ধার্থ আমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন! কী ভীষণ ভুলই না ছিল তা। আমি আমার মোহান্ধ মন দিয়ে ঈশ্বর পুরুষের পবিত্র মনকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

শত দারিদ্রেও আমি কিন্তু আমার সেই মালাটি কখনও বিক্রি করিনি। এরপর আরও কতগুলি বছর কেটে গেল। আমার স্বামীর একটা খুব শক্ত অসুখ করল। তাঁর সারা শরীর বিকট ঘায়ে ভরে গেল। নিকট আত্মীয়রা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল। কেউ তখন আর তাঁর পাশে নেই, তা দেখে আমি তখন তাঁর খুব সেবা করলাম। স্বামীর মনে অনুশোচনা দেখা দিল। তিনি বললেন, ‘তোমার উপর আমি অযথা অন্যায় করেছি। তবুও তুমি আমাকে কখনও অনুযোগ করনি। আজ সেই পাপেই আমি বোধহয় এই ভয়ানক রোগে ভুগছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো গৌতমী।’

আমি বহুবছর পর আবার আমার স্বামীর মন জয় করলাম। এরপর আমার একটি পুত্র সন্তান হল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি। জীবনে বেশি কিছু আমি চাইনি। ছোট ছোট আশা ছিল আমার। সংসার খুব ভালবাসতাম। তা যে শোকের কারাগার তা এরপর আমি বুঝতে পারলাম, তখনও মিথ্যে সুখের আশায় আমার মন অধীর ছিল। সেই শোক না পেলে, আজ আমি এখানে, এই সংঘে কিছুতেই আসতাম না। জীবনে যা কিছু হয়, সব কিছুর পেছনেই তাই মঙ্গলময়ের হাত থাকে। তারপর এল সেই ভীষণ দিন।

হঠাৎ কয়েকদিনের অসুখে প্রথমে আমার স্বামী মারা গেলেন, তারপরই মারা গেল আমার ছেলে। কী এক বিষাক্ত কীটের কামড়ে আমার ছেলে আমার চোখের সামনেই ছটফট করে মারা গেল। ছেলের মৃত্যু আমি সইতে পারলাম না। সকলে আমাকে ছেলের সৎকার করতে বললেও আমি তা করলাম না। ছেলে বুকে নিয়ে

কেবল কাঁদতে লাগলাম। আমি শুনেছিলাম, সিদ্ধার্থ এখন বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর অনেক খ্যাতি এবং অসাধারণ অলৌকিক ঋদ্ধি শক্তি। তিনি চাইলে আমার সন্তান আবার জীবিত হতে পারে। বুদ্ধের দৈব ওষুধ খেলে, ছেলে আমার আবার কথা বলবে এই ভেবে, আমি পাগলের মত তাঁর কাছে ছুটে গেলাম।

বুদ্ধকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই কি সেই রাজপুত্র সিদ্ধার্থ? যাঁকে সোনার বিচিত্র রথে চড়ে যেতে দেখেছিলাম? সেই তরুণ রাজপুত্র এখন যেন স্বয়ং ত্যাগ ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি। আমি তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। বুদ্ধ বুঝেছিলেন, ব্যথিত মাতৃহৃদয় কোনো সান্ত্বনাবাক্যে শান্ত হবে না। তিনি আমাকে বললেন, 'গৌতমী! শ্রাবস্তী নগরে যাও! এবং একটিমাত্র শ্বেত সর্ষের দানা নিয়ে এসো। তবে যে বাড়ি থেকে সেই সর্ষের দানা আনবে, সেখানে যেন এর আগে কারুর মৃত্যু না ঘটে থাক।' অর্থাৎ মৃত্যুহীন কোনো পরিবার থেকে সর্ষের দানা আনতে হবে।

আমি ভাবলাম, এ আর এমনকী কঠিন কাজ! বেরিয়ে পড়লাম সর্ষের সন্ধানে। কোলে ধরা ছিল আমার মৃত সন্তান। আমি তখনও আশা করছিলাম, একবার সর্ষে নিয়ে ফিরতে পারলেই বুদ্ধ কোনো দৈব ওষুধ তৈরি করে দেবেন, আর তা খেয়ে আমার ছেলে আবার আমাকে মা বলে ডেকে উঠবে!

কিন্ত হায়! সারাটা দিন শ্রাবস্তী নগরে ঘুরে বেরিয়ে এমন একটা গৃহ আমার চোখে পড়ল না যেখানে কখনও মৃত্যুশোক প্রবেশ করেনি। এভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল, সর্ষে সংগ্রহ করতে পারলাম না আমি। আমার মন ধীরে ধীরে অনাসক্ত হয়ে গেল।সন্তানের শবদেহটি নিয়ে দিনের শেষে আমি মশানে প্রবেশ করলাম। শ্মশানে ধনী মানুষের সৎকার হয়, আমার মত হতভাগ্যদের সৎকার হয় মশানে। সেখানে মৃতদেহ রেখে দিলে, তা বন্য জন্তুরা এসে খায়। আমি তারপর আমার পুত্রের দেহটা মশানের একপাশে রেখে দিলাম। এক মুহূর্তের মধ্যে আমার পুত্রের দেহটা শিয়ালেরা এসে ছিঁড়ে খেতে লাগল। আমি তখন নিঃস্ব, রিক্ত! একাকী। ক্লান্ত দেহ মনে ফিরে এলাম বুদ্ধের কাছে। আমাকে দেখে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ, সব জানা সত্ত্বেও বললেন, 'সর্ষের বীজ এনেছো গৌতমী?'

'সর্ষের বীজের আর প্রয়োজন নেই আমার। আপনি আমাকে দয়া করে প্রব্রজ্যা দান করুন! আমি জেনেছি, পৃথিবীর সকল জীবের একটিই ধর্ম–তারা সকলেই অনিত্য।'

কিসা গৌতমীর গল্প শেষ হল। গৌতমী আসব ক্ষয় করে শোক জয় করেছে, তবুও পুত্রের স্মৃতি তার দু চোখকে বাষ্পচ্ছন্ন করেছে আজ। সকলে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল, চিত্রার্পিতের মতো। সবার মুখের ভাষা যেন হারিয়ে গেছে।

থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে, সাধুদের ভিক্ষু বলা হয়। তাদের শাস্ত্রীয় সংহিতাকে পতিমোক্ষ বলা হয়, যা কিনা বৃহত্তর বিনয়ের একটি অংশ। তারা ভিক্ষুর জীবনযাপন করেন এবং প্রত্যহ সকাল হতেই ভিক্ষা সংগ্রহে (পালি: পিণ্ডপাত) বেরিয়ে পড়েন। স্থানীয় মানুষেরা ভিক্ষুদের খাদ্যদ্রব্য দান করেন, যদিও ভিক্ষুদের কিছু চাইবার কোন অনুমতি নেই। ভিক্ষুরা মঠে বসবাস করেন এবং প্রাচীন এশীয় সমাজে তাদের কাজকর্ম ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। অল্পবয়সী বালকদের শ্রমণ হিসেবে অভিষিক্ত করা হত। ভিক্ষু এবং শ্রমণ উভয়েই কেবলমাত্র

সকালে আহার করতে পারতেন এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনের কোন অনুমতি তাদের ছিল না। তাদের টাকা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল যদিও এই নিয়মটি এখন আর সকলে মানেন না। ভিক্ষুরা হলেন সংঘের অংশ – বুদ্ধ, ধম্ম, সংঘ–এই ত্রিরত্নের তৃতীয়টি।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম, 'সংঘ' অর্থে কঠোরভাবে বলতে গেলে তাদেরকে বোঝায় যাঁরা বোধির একটা নির্দিষ্ট পর্যায় লাভ করেছেন। তাই তাদেরকে 'গুনীবর্গের সম্প্রদায়ও' বলা হয়, যদিও এঁরা ভিক্ষু নাও হতে পারেন (অর্থাৎ সেরকম কোন শপথ নাও নিতে পারেন)। কিছু কিছু মহাযান সম্প্রদায়ে মহিলাদেরও 'ভিক্ষু' হিসেবে গ্রহণ করা হয়, আলাদা করে 'ভিক্ষুণী' বলা হয় না এবং তাদের পুরুষদের মতোই সমস্ত দিক থেকে সমান দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা হয়।

ভিক্ষুরা চারধরনের বস্তু লাভ করেন (বস্ত্র ছাড়া): একটি নরুন, একটি সূঁচ, একটি ভিক্ষাপাত্র এবং একটি জলের ঝাঁঝরি।

বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে, সন্ন্যাস হল 'ব্যক্তিগত মুক্তির দীক্ষা'র একটি অংশ, এই দীক্ষা নেওয়ার কারণ ব্যক্তিগত নৈতিক আচরণের উন্নয়ন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা এখানে (সাধারণ) সংঘ গড়ে তোলেন। বজ্রযানদের ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের দীক্ষায় চারটি ধাপ রয়েছে: একজন সাধারণ মানুষ ৫টি দীক্ষা নিতে পারেন যাকে বলা হয় "নৈতিক উৎকর্ষের দিকে অভিগমন।" পরবর্তী ধাপ হল সন্নাস জীবনে প্রবেশ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা তাদের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করেন। এরপর, একজন ব্রতী হতে পারেন (পালি: শ্রমণ); এর শেষ এবং অন্তিম ধাপে 'পূর্ণ অভিষিক্ত ভিক্ষু' হিসেবে তিনি সমস্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিব্বতী ভাষার 'গেলং' শব্দটির সংস্কৃত অর্থ ভিক্ষু (মহিলাদের ক্ষেত্রে 'ভিক্ষুণী')–এই শব্দটি পালি ভাষাতেও প্রচলিত যা থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে (শ্রীলঙ্কা, বর্মা, থাইল্যাণ্ড) ব্যবহৃত হয়।

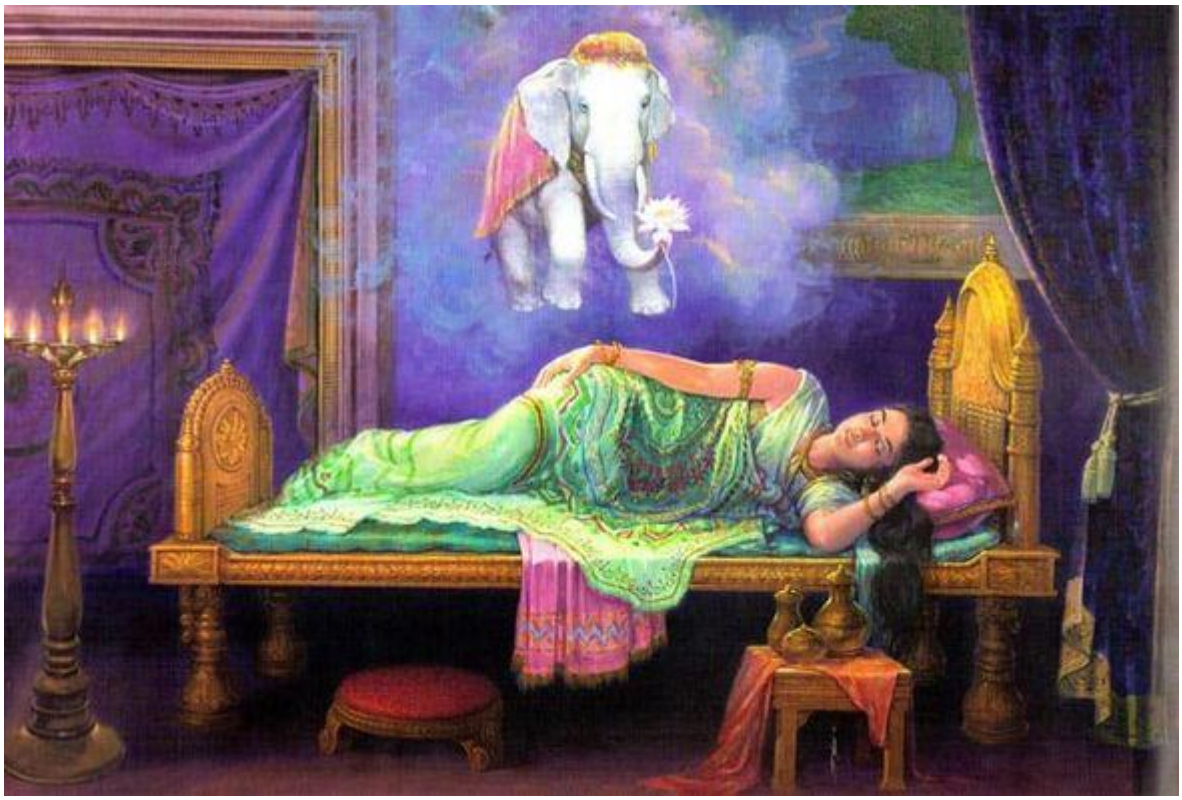

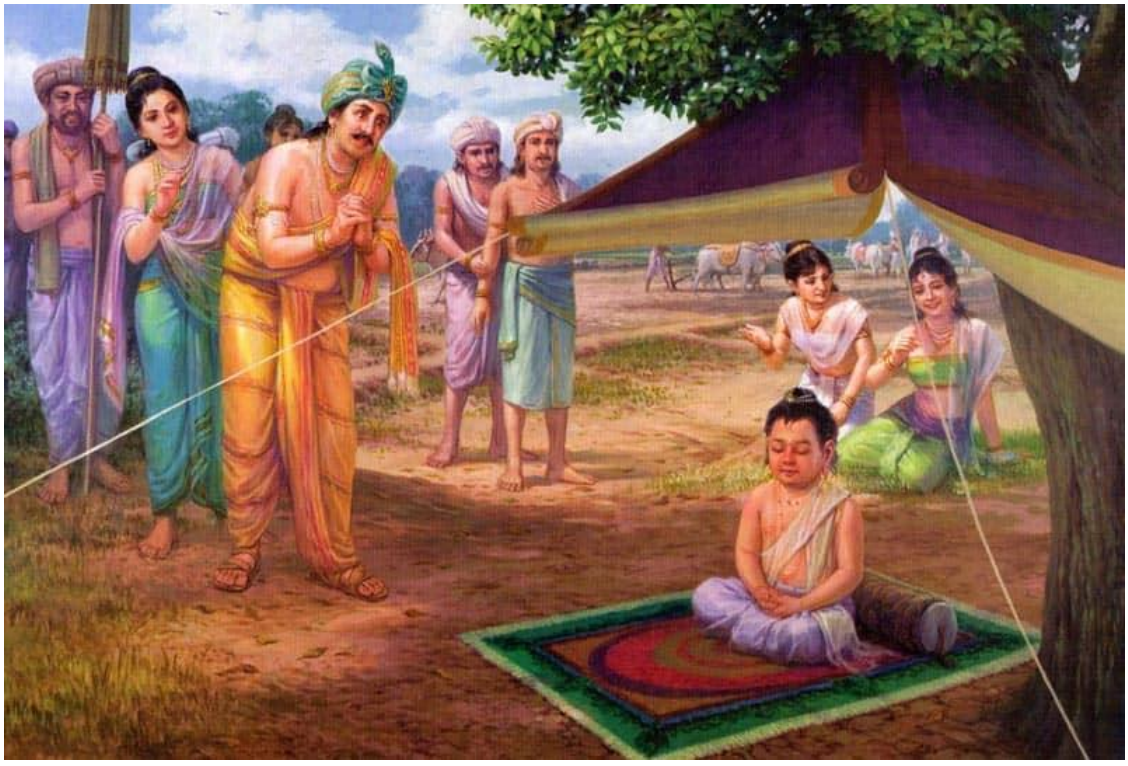

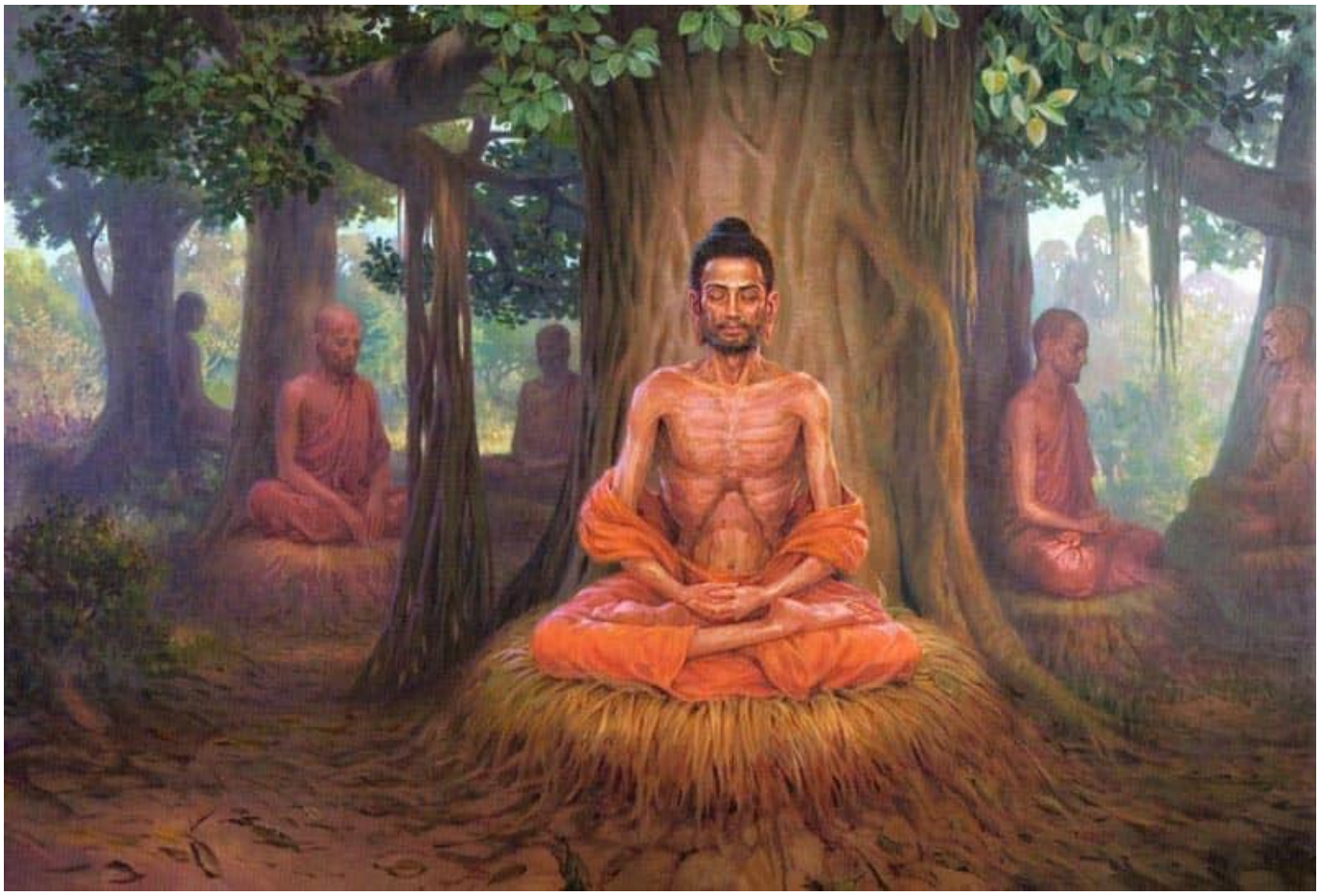

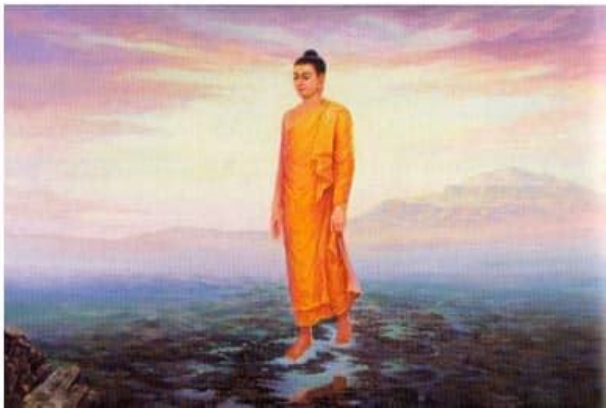

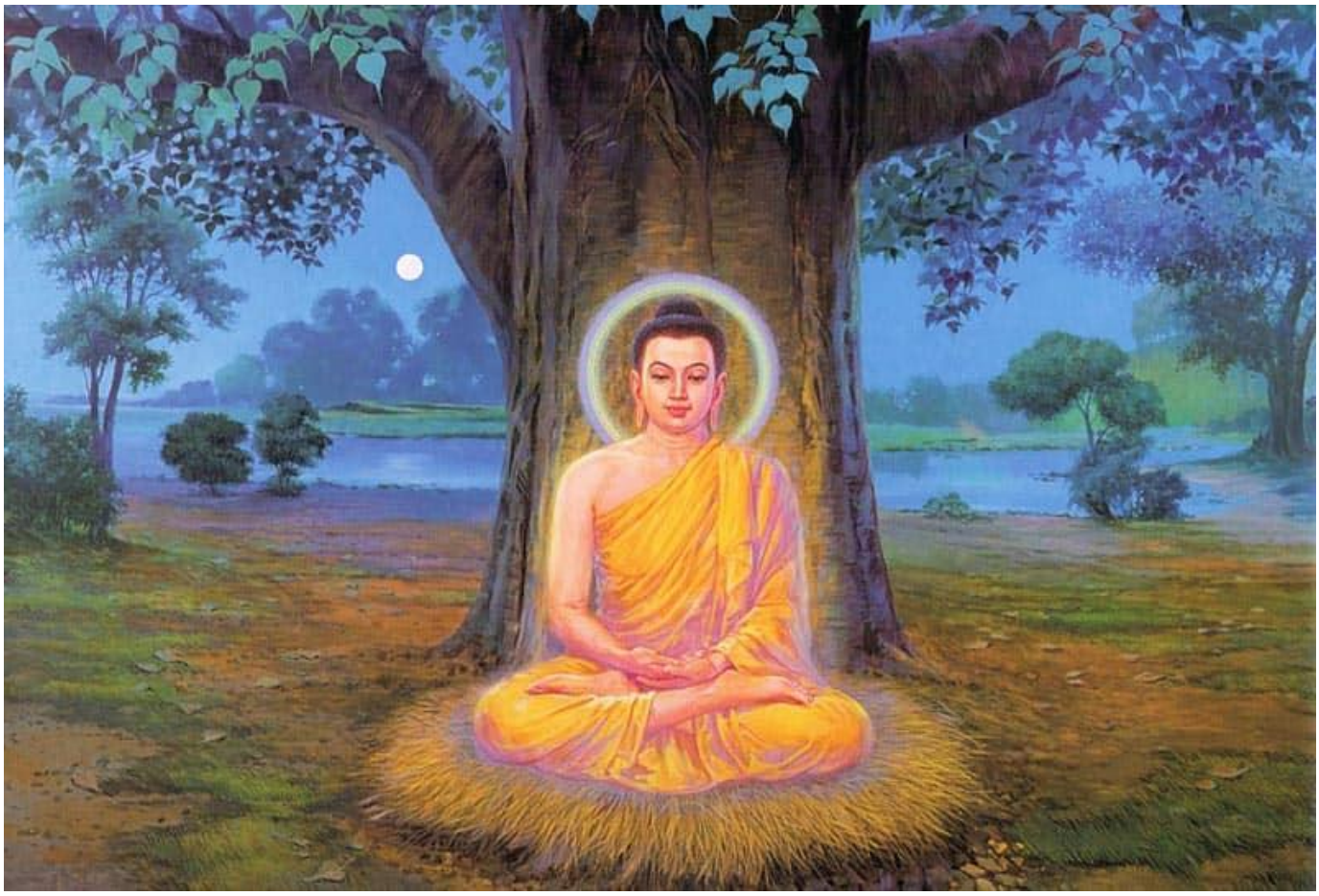

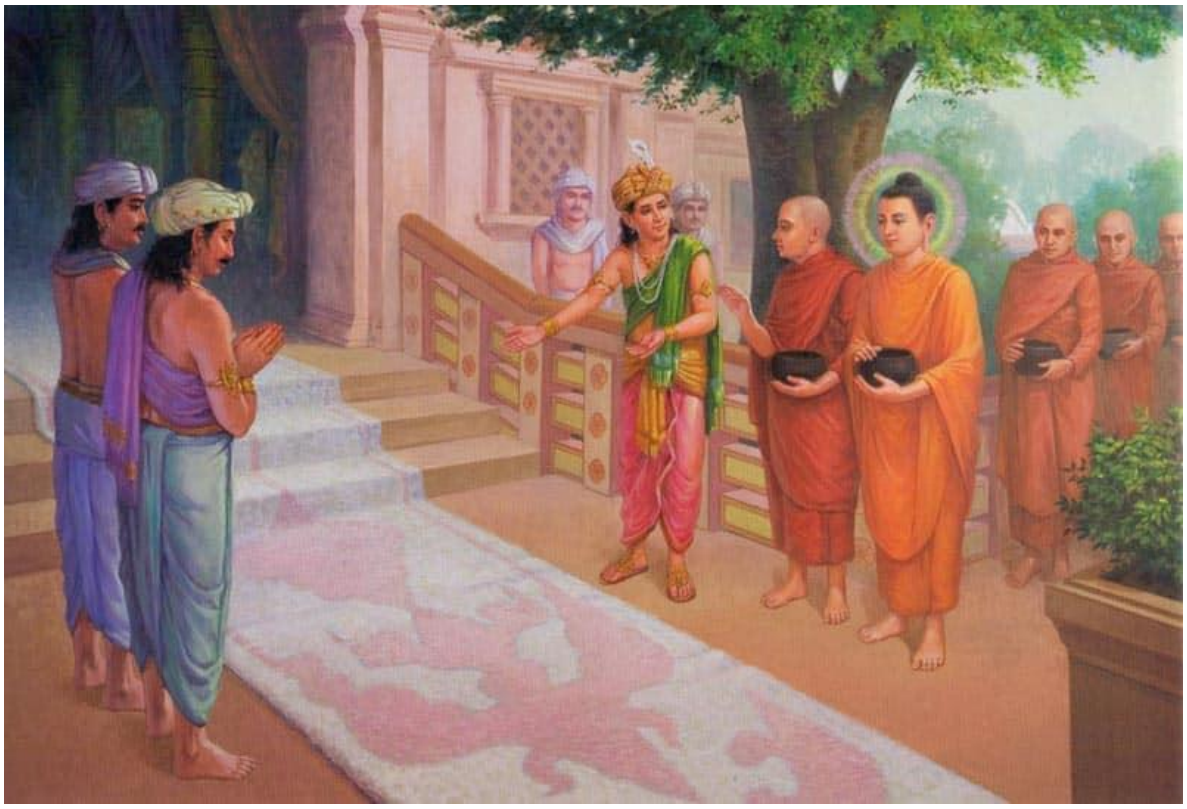

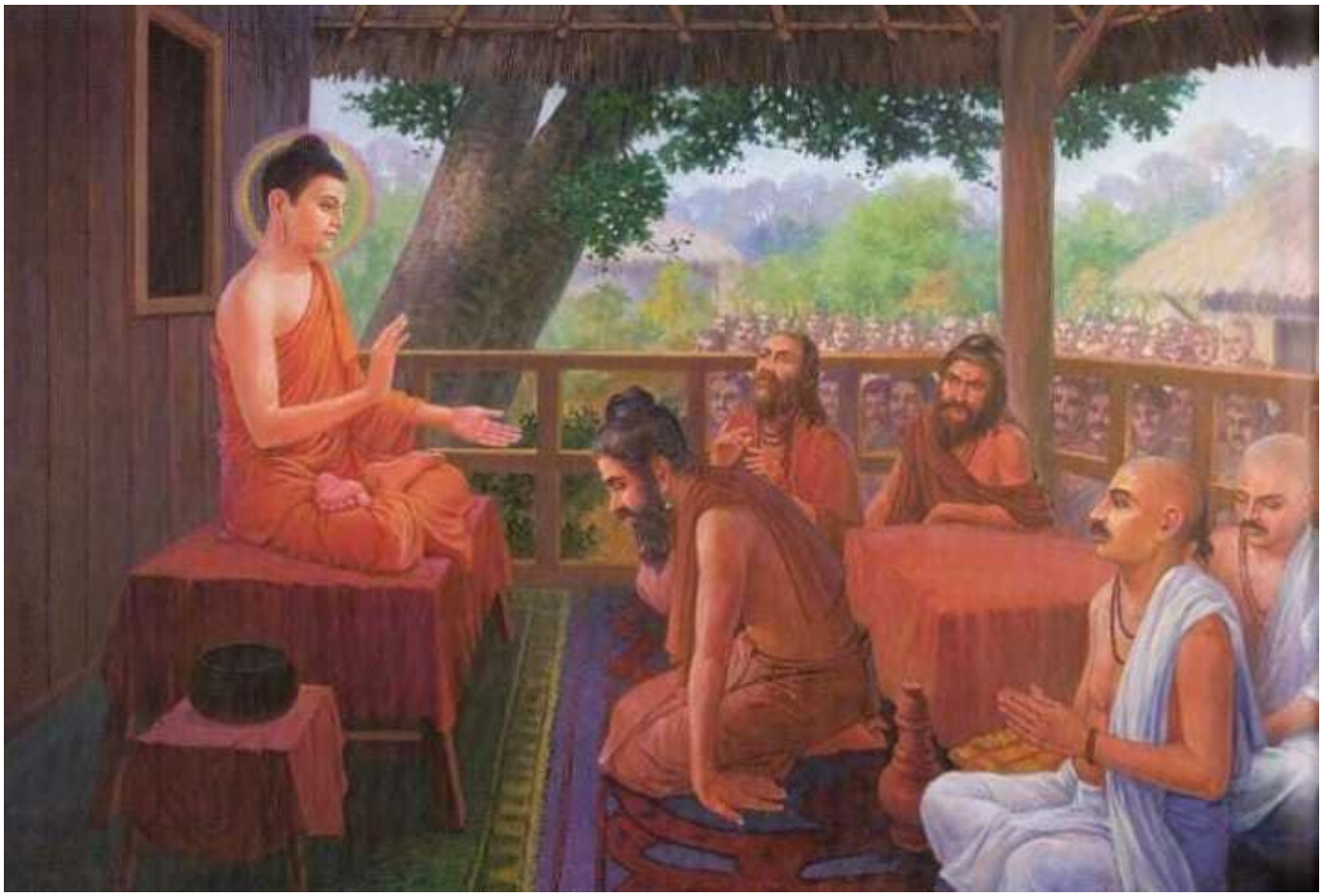

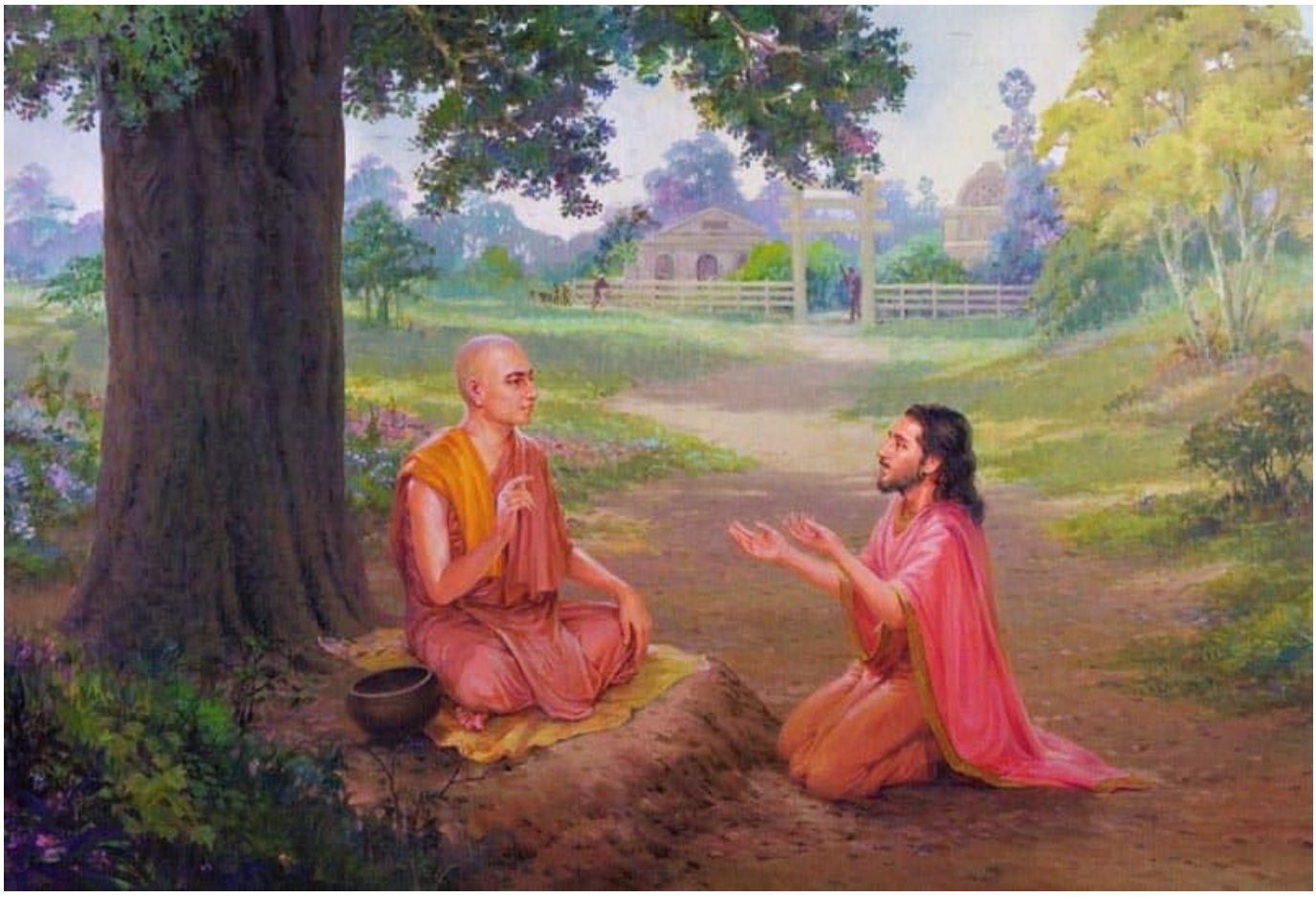

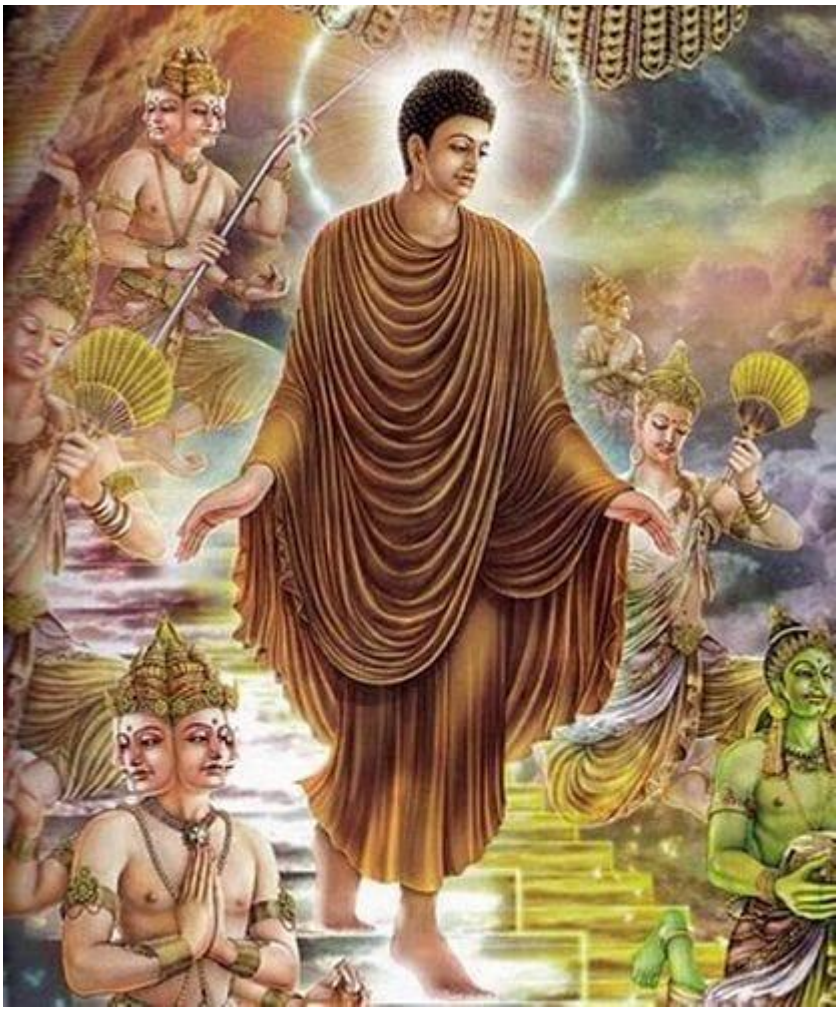

॥সমাপ্ত॥